Barcode - 4990010055883
Title - Shantilata
Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Author - Bandhopadhyay,Manik
Language - bengali
Pages - 122
Publication Year - 1960
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 055883

শান্তিলতা

[লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

২০৩।৪, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট্

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
২০৩।৪, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
সন্তোষ কুমার দাশ

প্রচ্ছদপট ব্লক
টাওয়ার হাফটোন কোং

মুদ্রাকর—শ্রীঅরবিন্দ সরদার
শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৪

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম—আড়াই টাকা

স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
তাঁরই সর্বশেষ উপন্যাস 'শান্তিলতা'
নিবেদন করা হল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস 'মাশুল' প্রকাশিত হবার দীর্ঘকাল পর তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'শান্তিলতা' প্রকাশিত হল। স্বর্গত লেখকের সাহিত্য-সাধনার সর্বশেষ কীর্তি হিসাবে এই বইটি বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে, সে দাবী ও আশা রাখি!

—প্রকাশক

ভূমিকা

॥ মানিক-প্রতিভা ॥

প্রায় ৩৬খানা উপন্যাস ও ১৭টি গল্প-সংকলনে মোট প্রায় ১৭৭টি ছোটো গল্প রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫৬ ইং) চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ৪৬ (বা ৪৮) বৎসরের অকাল নিমীলিত জীবনের ও ২৮ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনের সাক্ষ্য এই বিপুল দান। শোকাচ্ছন্ন বন্ধুদের পক্ষে এখনো তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এমন কি, তাঁর সকল লেখার সঙ্গে বহু পাঠক পরিচয়ও রাখতে পারেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থ-সমূহের সঠিক তালিকা সংকলন করতে গিয়ে গবেষণা-কুশল বন্ধুরাও বিপন্ন বোধ করেন। তাই তাঁর বিস্মৃতপ্রায় রচনাসমূহ ও বিলীয়মান স্মৃতিগুলিকে সযত্নে আহরণ করাও তাঁর বন্ধুদের ও সাহিত্যানুরাগীদের একটি গুরুতর দায়িত্ব। সে দায়িত্ব এখন পালন না করলে পরবর্তী কালে তা আরও দুঃসাধ্য হবে। কারণ, বাঙলাদেশে পাঠক-সাধারণের মনের সম্মুখে থেকেও এমন করে স্ব-সমাজের কৌতূহলদৃষ্টির অগোচর হয়ে যেতে বোধহয় আর কোনো সাহিত্যিক পারেন নি। অথচ ৩রা ডিসেম্বরের শোক-যাত্রায় ও ৭ই ডিসেম্বরের শোকসভায় যেভাবে সাহিত্যিক ও যুবক সমাজ স্বতঃ উৎসারিত বেদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম্ নিবেদন করেন তাতে স্পষ্টই বুঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা ও সৌহার্দ্য সামাজিক পুরস্কার ও অভিনন্দনের অপেক্ষা না রেখে কত গভীর ও নিবিড় ভাবে তাঁর দেশবাসীর ও সাহিত্যিক বন্ধুদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অবশ্য আত্মীয়তা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'টি পথ তাঁদের সম্মুখে এখনো উন্মুক্ত

আছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য-পালন তাঁদের সামাজিক কর্তব্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার সহিত তাঁর স্বদেশবাসীর ও বিদেশীয়দের পরিচয়-সাধন তাঁদের সাহিত্যিক কর্তব্য। কারণ, সাহিত্যিকের অমর-সত্তা সাহিত্য-আলোচনার সূত্রেই অমরত্ব লাভ করে, শোকাভিভূত বন্ধুগণের পক্ষেও তা স্মরণীয়। শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের সহিত সমকালীন সাহিত্যিকগণ সে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হলে সেই সাহিত্যিক কর্তব্যই পালন করবেন।

॥ ১ ॥

বহু শিথিল প্রয়োগ সত্ত্বেও 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। নৈসর্গিক সত্যের মতোই কচিৎ তার আবির্ভাব, এবং তর্কাতীত তার প্রকাশ। এ সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরাও অনেকেই জন্মেন না। তবু 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশক্তিকে আর কিছু বলার উপায় নেই। তাঁর অশান্ত প্রাণশক্তি ও প্রাণঘাতী পরিণামের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হয়—এ শুধু প্রতিভা নয়, এ তাঁর প্রকৃতি। এই তাঁর নিয়তি। সেই সঙ্গে তাই এই কথাও মনে হয়—এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়।

ইউরোপীয় ভাষায় যে দুর্জয় শক্তিকে 'ডীমন্' বলে অভিহিত করা হয়, আমরা তাকে কি নাম দিতে পারি জানি না। সর্বনীতি-নিয়মের অতীত সেই মানসশক্তি যেন নিজেই একমাত্র নিয়ম, নিয়তির মতোই সে অলঙ্ঘ্য ও অনিবার। সে শুধু সামাজিক নীতি-নিয়মের অতীত নয়। যাকে সে আশ্রয় করে তার দৈহিক মানসিক সমস্ত জীবনকেই সে কবলিত করে একমাত্র আপনার অমোঘ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নেয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা তাকে 'ডেভিল' বলতে পারেন, আর আমাদের অদৃষ্টবাদের দেশে বিমূঢ় হতাশায় আমরা তাকে 'নিয়তি'ও বলতে পারি। 'মেফিস্টোফিলিসে'র রূপকেও

আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলতে পারে কবিকল্পনা—সেই ক্রুর নিষ্ঠুর শক্তি যাকে কবলিত করে দানবীয় ঐশ্বর্যের বিদ্যুচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হয় তার নানা রীতি। আব সেই বিদ্যুজ্জ্বালাতেই ঝল্‌সে যায় তার দেহ, তার মন, তার আত্মা। কিন্তু এ রূপকেও আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এ শক্তিকে 'প্রকৃতি'ও বলতে পারতাম. 'প্রবৃত্তি'ও বলতে পাবতাম; কিন্তু 'প্রতিভা' বলেই এ ক্ষেত্রে আমরা তাকে স্বীকাব কবতে বাধ্য। আর তাব স্বরূপ বুঝলে বলতে পারি—এ হচ্ছে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'—বিদ্রোহেই যার আত্মপ্রকাশ, আর তাই আত্মনাশ যার আত্মপ্রকাশেরই প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ।

বাঙালা-সাহিত্যে 'বিদ্রোহী প্রতিভার' সঙ্গে আমাদের আরও সাক্ষাৎকাব না ঘটেছে তা নয়। আমরা মাইকেলকে জানি, নজরুলকে দেখেছি। মানিক মন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁদের সগোত্র। আত্মরক্ষার বুদ্ধি এঁদের নেই, এঁদেব অশান্ত প্রতিভাকে আত্মবিনাশ থেকে বিবত কবে এমন সাধ্যও কাবো হয় না। অবশ্য একই গোত্রেব হলেও এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, স্রষ্টা মাত্রই যেমন বিশিষ্ট। তা ছাড়া দেশকালের যোগাযোগ নানা রূপেই প্রত্যেকের পার্থক্য সুচিহ্নিত করে তোলে।

॥ ২ ॥

প্রতিভার জন্ম-রহস্য আজও অজ্ঞাত, পিতৃমাতৃ-পরিচয়ে তার সূত্রসন্ধান করা বৃথা। ১৯০৮-এই হোক বা ১৯১০-এই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায যখনি জন্মে থাকুন, ভদ্র শিক্ষিত পবিবাবের বৈজ্ঞানিক মনীষাসম্পন্ন তাঁব অগ্রজদেব কথা উল্লেখ করেও তাঁব প্রতিভার পরিচয় দান কবা সম্ভব হয় না। ববং পদ্মাতীরে তার পৈতৃক বাসভূমি ও পিতৃ-কর্মোপলক্ষে নানা অঞ্চলেব সঙ্গে তাঁর অচিবস্থায়ী পরিচয়,—এই পরিবেশেব স্থূল বা সূক্ষ্ম চিহ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব দুর্দান্ত প্রাণশক্তিতে ও তাঁব অস্থির, নির্মায়িক শিল্প-চেতনায় সন্ধান করা যেতে পারে। অবশ্য প্রতিভার গতি-প্রকৃতিও শুধু পরিবেশের আক্ষরিক বিচার দ্বারা (এনভাইরন্‌মেণ্টালিজম্‌-এর সূত্রে) বুঝা যায় না,

প্রতিভারও নিজস্ব প্রকাশরীতি আছে। না হলে পদ্মাতীরের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথেরই মত

'হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা কত শতবার

বলে অপূর্ব রহস্যাবেশে কৃতার্থ হতে পারতেন ; 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখবার কথা তাঁর মনেও উঠত না। কিংবা, রাঢ়ের-গ্রমে-প্রান্তরে আপনাকে তিনি তেমনি উদাস দৃষ্টিতে হারিয়ে ফেলতে পারতেন 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথে'। এইরূপ অবকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘটে নি, তার প্রথম কারণ—তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতো তা সুসংহত প্রতিভা নয়, সুষমায় যার অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত সাধনায় যা আপনাকে প্রকাশিত করবে। কাল ও দেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁরা আপন ব্যক্তি-প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করতে করতে আপন ব্যক্তিস্বরূপকে আবিষ্কার করতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, এবং নব-নব প্রকাশে নিজ শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে পারেন, তেমন সম্পূর্ণ ও আত্মগঠন-সমর্থ প্রতিভা মানিকের ছিল না। তাঁর প্রতিভা—বিদ্রোহী প্রতিভা। বিদ্রোহই তার মূল প্রকৃতি। তাই পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে একদিকে নব-নব স্পর্ধায় তা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে অন্য দিকে সেই স্পর্ধার সূত্রেই আপনাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে, উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে। এই সুতীব্র প্রকাশ যেমন সেই প্রতিভার ধর্ম, এই প্রচণ্ড বিনাশও তেমনি সেই প্রতিভার ধর্ম। এ জন্যই মনে হয়, প্রকৃতিই বুঝি এর নিয়তি, 'ক্যারেকটার ইজ ডেস্টিনি'।

কিন্তু প্রতিভার গতিপ্রকৃতি বিচারে দ্বিতীয় সত্যটিও এরূপই স্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই প্রতিভার গতি-প্রকৃতি কতকাংশে নির্ধারিত হয়ে ওঠে, তাতে ভুল নেই। এজন্যই মাইকেল বা নজরুলের সঙ্গে একদিকে সগোত্র হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র—মাইকেল উনবিংশ শতকের জাগরণের যুগে যে আশা-উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাতে তাঁর

বিদ্রোহী প্রতিভা বিপ্লবী প্রতিভায় উন্নীত হতে পেরেছিল। আমাদের কলোনিয়াল জীবনের সংকীর্ণতায় ও গ্লানিতে তা অতি অল্পকালের মধ্যেই আপনার ঐশ্বর্য খুইয়ে ফেলে; তারপর থেকে মাইকেল নিষ্প্রভ। শুধু 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' বলে সেই বিরাট প্রতিভা জলে পুড়ে খাকহয়ে গেল। নজরুলও বিংশ শতকের মানবমুক্তির একটা মহালগ্নকে আশ্রয় করে একবারের মত এমনি বিপ্লবী চেতনায় আপন বিদ্রোহী প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাল সংঘাতে তা সম্ভব হয় নি। বিদ্রোহী কবির আত্মদ্রোহী রূপই ক্রমে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

যুগ-সংকটের সেই তীব্রতর লগ্নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভব তখন আর সাময়িক ভাবেও এরূপ মহৎ আশায় প্রবুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিংশ শতকের ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কালটি বিশ্বসংকটেরও একটি তমিস্রা-ঘন পর্ব। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের—সোবিয়েত সাম্যবাদ "এক নূতন সভ্যতা?"—এ প্রশ্ন অবশ্য উদিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী-ব্যাপী তখন আর্থিক সংকট, ফ্যাশিস্ত-দানবতার তখন দাপট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশে ও সাহিত্যেও তখন পর্বটা শুধু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর্ব নয়। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বের অশ্রদ্ধাকে (সিনিসিজম) বাঙালী নাকী সুরে ও বর্ণচোরা ভাবালুতায় ঢালাই করছিলেন অতি-আধুনিক সাহিত্যিকরা—নকল হলেও এটা একটা পর্ব-লক্ষণ। কারণ প্রতিবাদের সুর সার্থক ভাবে তুলেছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ লেখক-গোষ্ঠী। কৃতী তরুণ লেখকেরা অনেকেই সন্ধান করছিলেন কৃতিত্বের পথ, কিন্তু যুগের নিজস্ব রূপ বা নিজেদের বাণীরূপ তখনো তাঁদের চেতনায় প্রতিভাত হয়নি। বরং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই আপনার নবীন বিকাশে তরুণদের সেই অসংবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রয়াসকে লজ্জা দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল কাব্যে, উপন্যাসে। অন্য দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্রষ্টা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ ও বিস্ময়-রসের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুরকে যেন

মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু যে বিক্ষোভ শতাব্দীর নাড়ীতে নাড়ীতে জমেছে,—দেশের পাঁজরে পাঁজরে যার দাগ পড়ছে,—তা এভাবে মিথ্যা হয়ে যায় না এ কথা বলাই বাহুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এই সত্যকেই ঘোষণা করে—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সুষমাবাদে আর তার কুলোয় না। অতি-আধুনিকের প্রতিবাদ এবার নাস্তিক্যের বিদ্রোহে রূপায়িত হল। আর মানিকের বিদ্রোহী প্রতিভা যুগের সেই সঞ্চিত বিক্ষোভকে যে রূপদান করলে তা বাঙলা সাহিত্যে তার পূর্বে বা পরে এখন পর্যন্ত আব কারও দ্বারা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রতিভার অধিকারী আর কেউ সে যুগ্য-ব্যাধিকে এমন করে অনুভব কবতে পরেন নি।

কিন্তু এইটিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কথা নয়। সভ্যতার সেই শব-ব্যবচ্ছেদ-সূত্রেই এই সত্যেরও আভাস পান লেখক—শবটাই সব নয়। শব শুধু জীবন-হীন দেহ। আর জীবন একটা পরমাশ্চর্য সত্য,—তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা তাঁকে মানতে না চাইলেও সে সত্যই থাকবে। এইখান থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনার দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা। বিদ্রোহী প্রতিভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানবতায় বিশ্বাসী লেখকের। জীবনে ও মানবতায় বিশ্বাস নিয়ে ১৯৪৩-এর প্রারম্ভ থেকে তিনি চাইলেন নবজীবনবাদের ভিত্তিমূল রচনা করতে। তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভাকে চাইলেন বিপ্লবী প্রতিভায় রূপান্তরিত করতে। যাঁরা মানিক-প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁরাই বুঝবেন এ কত বড়, বিরাট ও দুর্জয় সাধনা। তাঁর প্রতিভাবই একাংশের সঙ্গে তাঁর আত্মার এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সংগ্রাম। আর তাঁরাই সশ্রদ্ধ হৃদয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শেষপর্বের সাধনাকে অভিনন্দিত করবেন —মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছুবার প্রয়াস জীবনেরই মূল বাণী।

॥ ৩ ॥

১৯২৮ (ইং) সনের যে দিনটিতে ঘটনাক্রমে 'অতসী মামী' গল্পটি লিখিত হয়

এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের সে গল্প (বিচিত্রা, ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়, সেদিন থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার প্রকাশ-পথও আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। এমন সত্য কথা আর নেই—পরবর্তী আটাশ বৎসরে "অন্য কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই।" তাঁর প্রতিভা তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি, জীবনের শত আবর্তে তাঁকে বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত করেও আমরণ সাহিত্যের সৃষ্টি-স্রোতেই একূলে-ওকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম গল্প 'অতসী মামী' ও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'তে (১৯৩৫, মার্চ) বাঙলা কথা-সাহিত্যের পরিচিত পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের প্রতিভার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রতিভা প্রায় তখনই তার নিজস্ব খাত আবিষ্কার করে ফেলেছে। 'অতসী মামী' নামক প্রথম গল্প-সংগ্রহও এ সময়েই (১৯৩৫, আগস্ট) প্রকাশিত হয়। তার দশটি গল্পের মধ্যে আছে 'সপিল', 'আত্মহত্যার অধিকার' প্রভৃতি মানিক-প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর সম্বলিত গল্প। কিন্তু তারও পূর্বে তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্যে'র প্রাথমিক পরি-কল্পনা ও আদি-লিখন (১৯২৯ ? ১৯৩১ ?) শেষ হয়েছে। 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প (বঙ্গশ্রী ১৩৪০ বাং আশ্বিন) রচিত হয়েছে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নিবার্য প্রতিভা (বাং ১৩৪১ এ বঙ্গশ্রীতে) ভাঙাগড়ার সূত্রে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অস্থির মনকে ভেঙে গড়ে যে কী রূপ দান করতে চলেছে, তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ১৯৩৫ (ডিসেম্বর) সনেই 'দিবারাত্রির কাব্য'ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকাররূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তাই এই বৎসরেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যেই তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছে। তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে বাঙলা সাহিত্যে অভিনব সে বিষয়ে ১৯৩৫ এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনেও সংশয় নেই। 'অতসী মামী গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন, "অতসী মামী' আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।" 'দিবারাত্রির কাব্যের নিবেদনাংশ

আরও উল্লেখযোগ্য—"দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক (তা না মনে হয়ে পারে না—লেখক)—তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক-কাহিনী। কিন্তু লেখক এ কথায়ও সুস্থির বোধ করেন না, কারণ এক অর্থে সমস্ত উপন্যাসই তো রূপক, কোনো জীবনসত্যের রূপদান। আর অন্য অর্থে, রূপক কখনো উপন্যাস হতে পারে না। রূপকের সাধারণকৃত রীতিতে মানব সত্যকে ঢেলে সাজলে 'চরিত্র' তার বৈশিষ্ট্য হারায়। লেখক তাই 'রূপক কাহিনী' বলেই আবার বলছেন, রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projectionমানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

'দিবারাত্রির কাব্য'ই মানিক প্রতিভার প্রথম ও বিশিষ্ট নিদর্শন। তাই এ কাব্যের এই নিবেদনাংশটুকুকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিশ্লেষণে দেখতে পাই—প্রথমত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে তাঁর রচনার গোষ্ঠীবিচারে কত অসমর্থ। এ কাহিনীর জন্ম ও বিকাশ, ভাঙা গড়ার ইতিহাস (শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডে তা লিখিত হয়েছে) জানলে বেশ বুঝা যায়—মানিকের প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে কিভাবে এ কাহিনীর কথা-অংশ গড়ে তুলেছে। কিভাবে তার রূপ রীতি নির্ণীত করে ফেলেছে। মানিকের শিল্পীসত্তা আত্মসচেতন না হয়ে আত্মনিবেদনেই দুর্জয় শক্তির অধিকারী।—মানিক-সাহিত্যের বিচারকালে এই মূল সত্যটি পরীক্ষা করার মত কারণ বারবার জুটবে।

দ্বিতীয়ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পরতীর সুপরিচিত বাস্তবপদ্ধতি নয়—মানুষকে বিশিষ্ট মানুষকে আশ্রয় করে তিনি চরিত্র-সৃষ্টিতে অগ্রসর হননি বরং অনুভূতিকেই আশ্রয় করে—অমূর্ত ধারণাকে গ্রহণ করে—তাকেই মানব-চরিত্ররূপে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের

Projection। সাবজেক্ট বা বিষয় থেকেই তিনি বিষয়ীকে চিনতে চান। ভাব থেকে যান রূপে।

তৃতীয়ত, এই সাধারণীকৃত সূত্র বা ভাব-উপাদনকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রহণ করেছেন "মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ"—সম্পূর্ণ ভাব-জীবনও নয়, ভাব-জীবনের একটা খণ্ডাংশ।

কোন লেখকের প্রথম প্রকাশিত কোনো এক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে এত বড়ো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিশ্চয়ই অসমীচীন। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানিক-প্রতিভার স্বরূপ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই এর গুরুত্ব। মানিক-প্রতিভার দু'একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করছি। পৃথিবীর সাহিত্যে এগুলির স্থান স্বীকার করতেই হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭এ গ্রন্থকারে প্রকাশিত) অন্যতম। মানিকের নাস্তিক্য-প্রতিভারও তা একটা বিশিষ্ট প্রমাণ। কথা বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গল্প একটা বীভৎস রোমান্টিক কাহিনী। একে বাস্তব বলা অসাধ্য। আর ভাববস্তুর দিক থেকে এর বক্তব্য পরিস্ফুট। গল্পের উপসংহারে—পাঁচীকে পিঠে লইয়া ভিখু যেখানে জোরে জোরে পথ চলিতেছে:

> "দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।
>
> "হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারা-বাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল অবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোন দিন পাইবেও না।"

বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে এই মন্তব্য অচল। মানব-প্রকৃতি যে অর্থে

অপরিবর্তনীয়, সে অর্থটি অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ শুধু প্রাগৈতিহাসিক ক্রূরতার জালে আবদ্ধ পশু নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। মানবতা বলতে আমরা আজ যা বলি তাও তার ধর্ম, এবং সে ধর্মই দিনে দিনে নব বোধে নবায়মান। তাই মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক প্রমাণ করবার জন্য প্রথমত অনুভূতির কয়েকটা খণ্ডকেই লেখক পাচী ভিখু প্রভৃতি রূপে দাঁড় করিয়েছেন,—অদ্ভুত প্রতিভায় সেই রোমান্টিক আখ্যানে সত্যাভাস সংযোগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি খণ্ড-সত্যকে—এমন কি অপ্রধান সত্যকে,—সমগ্র সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এ গল্পের অনস্বীকার্য-সার্থকতা এই যে, প্রতিভা এমন নিঃসংশয়ে এই খণ্ড-সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে যে, শত সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা আমাদেরও গহন মনের কোনো গহ্বরে লুক্কায়িত নেই। অর্থাৎ যে অংশটি আমাদের সচেতন মনের অগোচরে, সে অংশটা আমাদের চেতনালোকে অনুভূত হয়ে উঠল।

ঠিক একথাই বলা চলে তাঁর আরও ভয়ঙ্কর গল্প 'সরীসৃপ' সম্বন্ধে। তার অনায়াস বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যে যে শিল্পকুশলতা মিলিয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে দুর্ভার পীড়নে যেখানে হেমলতার প্রশ্নে,—'হারে ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?'—বনমালী বলে, 'আপদ গেছে, যাক।'

এর পরে হয়তো মন্তব্য শিল্প-নিয়মে দোষাবহ—যদি না সে মন্তব্য হয় এমন নির্মম :

"ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।"

নাস্তিক্য-প্রতিভার এমন উক্তি আর ক্বচিৎ দেখা যায়। কিন্তু কে না জানে এ উক্তিও অর্ধ-সত্য নয়, বারো আনা মিথ্যার সঙ্গে বড় জোর চার আনা সত্যের ভেজাল? অথচ সমস্ত গল্পটি যে চতুরতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে,

নিরাসক্ত শিল্প-দৃষ্টিতে তার হিংস্রতা ও ক্লেদাক্ত পর্যায় একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে সভ্যতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রূপ-শাণিত বক্রোক্তি মোটেই অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মানবতাও মিথ্যা নয়, মানুষের সভ্যতাও যে মানুষকে সুস্থতর জীবন-বোধেই জাগ্রত করছে তাতেও সন্দেহের কারণ নেই। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ক্ষয়ও একমাত্র সত্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম তাতে আছে। সমগ্র মানুষকে গ্রহণ না করে মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশকে গ্রহণ করলে মিথ্যাই এইরূপে সত্য হয়ে উঠতে চায়। গল্পটি তথাপি এক অমোঘ সৃষ্টি—প্রতিভাই এই অমোঘতা দিয়েছে।

এ-তুলনায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) ও 'পদ্মানদীর মাঝি'তে (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'নাস্তিক্য-প্রতিভা অনেকটা সুশৃঙ্খল। পদ্মাপারের যে কোনো লোক জানেন—পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনযাত্রার দিক থেকে যে উপন্যাসের চিত্র অনেকাংশেই অযথার্থ, বিশেষত হোসেন মিঞার কলোনি-গড়ার আকাঙ্ক্ষা যেন অবিশ্বাস্য একটা রোমান্টিক রচা কথা। কিন্তু উপন্যাসের এই দীর্ঘতর আয়তনে এক-এক টুকরো মানসিক অংশ নিয়ে কাহিনী রচনা করা চলে না। তাই এই কাহিনীতে অসঙ্গতি ও গঠন-দোষ থাকলেও একটা সমগ্রতা আছে। আর, তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি ও সরসতা কাহিনীকে স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। প্রতিভা এখানে মানুষকে অনেকটা পথ ছেড়ে দিয়ে আপনার সার্থকতা আরও সুনিশ্চিত করে তুলতে পেরেছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়ও এই পরিমিত রঙ্গবোধ নিষ্ঠুর বিদ্রূপবোধে পরিণত হয় নি। মানুষ সেখানে শয়তানের খেলায় উপাদান ততটা নয় যতটা সে কামনা-বাসনার খেলার পুতুল। সেই পুতুলের জন্য বিদ্রূপেও লেখকের একটু ক্ষীণ অনুকম্পা আছে—হায়রে পুতুল! আর পুতুলই হোক, আর যাই হোক্, উদ্ভট, অদ্ভুত, উচ্ছৃঙ্খল, সাধারণ, অসাধাণ সকল খেলার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যেকেই যে মানুষ এই সত্যটা অস্বীকার করবার মতো আক্রোশ তখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে পেয়ে বসে নি। কিন্তু

ক্রমেই তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়ে বসে। 'টিকটিকি' (মিহি ও মোটা কাহিনী, ১৯৩৮) প্রভৃতি ছোটোগল্পে তা ক্রমেই শ্বাসরোধী একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে করে চলে, চতুষ্কোণের (১৯৩৮) মতো উপন্যাসে পর্যন্ত সেই যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃত বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তার পূর্বেই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চাপা অন্ধকার থেকে মানিক বন্দোপাধ্যায় আত্মোদ্ধারের পথ সন্ধান করছিলেন। সে পথ তিনি বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করেন মার্কস্‌বাদের আলোকে, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা সে পথকে মানতে প্রস্তুত ছিল না—এবং শেষ পর্যন্তও এই প্রতিভা সে পথে তাঁকে স্বচ্ছন্দ পদে চলতে সহায়তা করে নি। 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) প্রভৃতি গল্পের সময় থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নূতন পথের সন্ধান সম্ভবত আরম্ভ হয়। 'সমুদ্রের স্বাদ' দুঃখবাদে করুণ হলেও জীবন-সম্বন্ধে নৈরাশ্যেরই সূচক। 'বৌ' (১৯৪৩) ও 'ভেজালে'র (১৯৪৪) অধিকাংশ গল্পও সেই জীবন-বিরূপ প্রতিভারই সৃষ্টি। 'দর্পণে সেই নব প্রয়াস ও বিরূপ-চেতনার বাঁকা-চোরা প্রতিলিপিই পড়েছে।' এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়ে নিষ্ক্রান্ত হবেন, এমন সম্ভাবনা হয়তো ছিল না। কারণ তাঁর প্রতিভা এই নূতন ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে না।

তথাপি তাঁর শক্তির স্বাক্ষর, অদ্ভুত শিল্প-কুশলতা নানা গ্রন্থেই দেখা গিয়াছে। এক-একবার মনে হয়েছে হয়তো প্রতিভাকে তিনি এবার কবলিতে করতে পারলেন,—যেমন, কোথাও কোথাও 'আজ-কাল-পরশুর গল্পে' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি'তে (১৯৪৬), 'চিহ্ন' উপন্যাসে (১৯৪৭) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'তে (১৯৪৯), 'সোনার চেয়ে দামী'র প্রথম ভাগে (১৯৫১) 'পাশাপাশি' উপন্যাসে (১৯৫২) 'হরফ' উপন্যাসে (১৯৫৪) 'মাশুল' উপন্যাসে (১৯৫৬) এবং এরূপ আরও অনেক লেখায়। কিন্তু তাঁর ক্ষয়িষ্ণু দেহে ও ক্ষীয়মান প্রাণ সমস্ত সম্ভাবনা ও সংগ্রাম সমাপ্ত করে অবশেষে অকালেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

এক জন্ম থেকে আর-এক জন্মে পৌঁছানো—এই জীবনের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘটানো—মানিক-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হল না কেন তা আমরা দেখেছি। হয়তো তা সম্ভব হত যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো পথে এই জন্মান্তর কামনা করতেন। যে গভীর বক্রদৃষ্টিতে তিনি সভ্যতা ও মানবতাকে অন্তঃসার হীন বলে চিনছিলেন, তা থেকে মুক্ত না হয়েও কোনো কোনো শিল্পী নিষ্কৃতি পান—দেবতার নামে আত্মনিবেদন করে, পাপোহম্ পাপসম্ভাবহম্ বলে খ্রীষ্টীয় পাপানুভূতি ও ভগবদানুভূতিতে। স্টেভয়ভ্স্কির মতো, বা আধুনিক ইউরোপীয় ক্যাথলিক-বিশ্বাস-বাদী গ্রেহাম গ্রীন প্রভৃতি শিল্পীর মতো একটা পথ গ্রহণ করলে—মানুষকে অস্বীকার করে, জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেও একটা ভাবলোকে আশ্রয় রচনা করা যায়। সেরূপ আশ্রয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী প্রতিভাকেও পরিত্যাগ করত না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরূপ আশ্রয় না চেয়ে চাইলেন পৃথিবীকে, জীবনকে, মানুষকে,—যে সবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিভার বিদ্রোহ, যাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর প্রতিভা পরিপুষ্ট। দেবতায় বা পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস অনেক সহজ, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস, সভ্যতায় বিশ্বাস অনেক দুশ্চর সাধনা-সাপেক্ষ। এ সাধনাকে গ্রহণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মানবীয় সততার প্রমাণ ও শিল্প-সত্তার এক মহৎ ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন—যারা সাহিত্য বিশ্বাসী মানবতায় বিশ্বাসী তাদের জন্য, রেখে গিয়েছেন পরাহত মানবাত্মা ও মানুষের এই জয়স্তম্ভ। *

গোপাল হালদার

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা 'পরিচয়' হইতে গৃহীত]

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। জননী, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ মার্চ ১৯৩৫, পৃঃ ২৮৪ (সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ)।

২। অতসীমামী, গল্প, ৭ আগষ্ট ১৯৩৫, পৃঃ ২৬৭।

৩। দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস, ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃঃ ২০৪।

৪। পুতুলনাচের ইতিকথা, উপন্যাস, ১৯৩৬।

৫। পদ্মানদীর মাঝি, উপন্যাস, ২৮ মে ১৯৩৬।

৬। জীবনের জটিলতা, উপন্যাস, নভেম্বর ১৯৩৬, পৃঃ ১৩১।

৭। প্রাগৈতিহাসিক, গল্প, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৭, পৃঃ ২২৪।

৮। অমৃতস্য পুত্রাঃ, উপন্যাস, জুলাই ১৯৩৮, পৃঃ ২২০।

৯। মিহি ও মোটা কাহিনী, গল্প, সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ পৃঃ ১৬২।

১০। সরীসৃপ, গল্প, ১৭ আগষ্ট ১৯৩৯, পৃঃ ১৭৬।

১১। সহরতলী—প্রথম পর্ব, উপন্যাস, ১৯৪১, পৃঃ ২০৮ (?)

১২। সহরতলী—দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪১, পৃঃ ১৩৫।

১৩। বৌ, গল্প, ১৯৪৩, পৃঃ ২৬৪।

১৪। সমুদ্রের স্বাদ, গল্প, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, পৃঃ ১৫২।

১৫। প্রতিবিম্ব, উপন্যাস, পৃঃ ৯০।

১৬। ভেজাল, গল্প, ১৯৪৪, পৃঃ ১৪৪।

১৭। দর্পণ, উপন্যাস, জুন ১৯৪৫, পৃঃ ৩২০।

১৮। হলুদপোড়া, গল্প, ১৯৪৫।

১৯। সহরবাসের ইতিকথা, উপন্যাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬।

২০। আজকাল পরশুর গল্প, গল্প, মে ১৯৪৬, পৃঃ ১৭০।

২১। ভিটেমাটি, নাটক, মে ১৯৪৬, পৃ: ৯৬।

২২। চিন্তামণি, উপন্যাস, জুলাই ১৯৪৬, পৃ: ১০১।

২৩। পরিস্থিতি, গল্প, অক্টোবর ১৯৪৬, পৃঃ ১৬১।

২৪। চিহ্ন, উপন্যাস, জানুয়ারী ১৯৪৭, পৃঃ ১৯৬।

২৫। আদায়ের ইতিহাস, উপন্যাস, ১৯৪৭, পৃ: ৮২।

২৬। খতিয়ান, গল্প, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪৯।

২৭। চতুষ্কোণ, উপন্যাস, ১৯৪৮, পৃঃ ১৭৫।

২৮। মাটির মাশুল, গল্প, ১৯৪৮, পৃঃ ১৬৩।

২৯। অহিংসা, উপন্যাস, ১৯৪৮, পৃঃ ২৬১।

৩০। ধরাবাঁধা জীবন, উপন্যাস, পৃঃ ৯২।

৩১। ছোটবড়, গল্প, ১৯৪৮, পৃঃ ১৫৩।

৩২। ছোট বকুল পুরের যাত্রী, গল্প, ১৯৪৯, পৃঃ ৯২।

৩৩। জীয়ন্ত, উপন্যাস, জুলাই ১৯৫০, পৃঃ ২৫৬।

৩৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প, জুলাই ১৯৫০, পৃঃ ২৩৮

৩৫। মানিক গ্রন্থাবলী প্রথমভাগ, জুলাই, ১৯৫০, পৃঃ ২৩৬।

৩৬। পেশা উপন্যাস, ১৯৫১, পৃঃ ২০০।

৩৭। স্বাধীনতার স্বাদ, উপন্যাস, ২০ জুন ১৯৫১, পৃঃ ২৬১।

৩৮। সোনার চেয়ে দামী, উপন্যাস, জুন ১৯৫১, পৃঃ ১২৭।

৩৯। ছন্দ পতন, উপন্যাস, ১৯৫১, পৃঃ ১৬৬।

৪০। সোনার চেয়ে দামী ২য় খণ্ড, উপন্যাস, ১৯৫২, পৃঃ ২২৭।

৪১। মানিক গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৯।

৪২। ইতিকথার পরের কথা, উপন্যাস, ১৯৫২, পৃঃ ২৬৫।

৪৩। পাশাপাশি, উপন্যাস, ১৯৫২, পৃঃ ২০৬।

৪৪। সর্বজনীন, উপন্যাস, ১৯৫২, পৃঃ ২৫২।

৪৫। আরোগ্য, উপন্যাস, ১৯৫৩, পৃঃ ১৮৪।

৪৬। তেইশ বছর আগে পরে, উপন্যাস, ১৯৫৩, পৃঃ ২৩৩।

৪৭। নাগপাশ, উপন্যাস, ১৯৫৩, পৃঃ ১৯৬।

৪৮। ফেরিওলা, গল্প, ১৯৫৩, পৃঃ ১৪৩।

৪৯। চালচলন, উপন্যাস, ১৯৫৩, পৃঃ ১১৩।

৫০। লাজুকলতা, গল্প, ১৯৫৪, পৃঃ ১৬০।

৫১। শুভাশুভ, উপন্যাস, ১৯৫৪, পৃঃ ২৬০।

৫২। হরফ, উপন্যাস, মে ১৯৫৪, পৃঃ ২৪৪।

৫৩। পরাধীন প্রেম, উপন্যাস, ১৯৫৫, পৃঃ ১৮৯।

৫৪। হলুদ নদী সবুজ বন, উপন্যাস, ১৯৫৬, পৃঃ ২৭৮।

৫৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প, গল্প, ১৯৫৬, পৃঃ ২২৯।

৫৬। মাশুল, লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ (উপন্যাস), অক্টোবর ১৯৫৬, পৃঃ ২১৪।

॥ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ॥

৫৭। প্রাগেশ্বরের উপাখ্যান, উপন্যাস, ডিসেম্বর ১৯৫৬ পৃঃ ১০৮।

৫৮। মাটি ঘেঁষা মানুষ, উপন্যাস, ১৯৫৭।

৫৯। লেখকের কথা।

শান্তিলতার রঙ খুব কালো।

গড়ন-পিটন আশ্চর্য রকম।

খাঁটি ভীল সাঁওতাল মেয়েদের পর্যন্ত যেন হার মানিয়ে দিতে পারে।

এমন স্বাস্থ্য খুব কম দেখা যায়।

খায় তো ডালভাত আর শাকচচ্চড়ি।

কী করে তার এমন স্বাস্থ্য হল—বড় বড় ডাক্তাররা মাথা ঘামিয়ে তার হদিস পাবে বলে মনে হয় না।

রোগ-ব্যারামেব ব্যাপারটা রোগ-ব্যারামের ব্যাপার।

স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা স্বাস্থ্যের ব্যাপার।

ডাক্তারেরা যেন হিসেব করতে পারছে না।

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

এলোমেলো চিকিৎসা চালাচ্ছে।

ডাক্তার ডাকার নামেই শান্তি তাই রেগে ওঠে :

—ডাক্তার দরকার নেই। নিজের অসুখ নিজেই সারিয়ে নেব। ডাক্তার এসে করবে কী? মিকশ্চার খাওয়াবে—দেড়টাকা দুটাকা দাম নেবে মিকশ্চারের। আমার দরকার নেই। ডাক্তার ছাড়াই আমি দিব্যি সেরে উঠব।

মনোলতার বড় ছেলে ডাক্তার।

ছেলের বিয়ে দিয়েছে মনোলতা।

বৌ তার পছন্দ হয় নি।

একেবারে যেন খুশীমুখী খেয়াল-খুশী ইয়ার্কি-মারা মেয়ে।

এমনভাবে চলাফেরা করে যে মনে হয় তারাই বুঝি আকাশচারী দেবতার সামিল।

দেবতা!

রক্তমাংসের মানুষ।

মানুষকে বোকা বুঝিয়ে দেবতা হতে চায়।

মানুষ এ ইয়ার্কি সহ্য করতে রাজী হয় না।

তাই বেধে যায় সংঘাত।

সংঘাতে সংঘাতে ফাটাফাটি বাধে।

শান্তিলতার বাবা চন্দ্রনাথেরও মরণ ঘটেছিল ওইভাবে।

চিকিৎসা চালাবার চেষ্টা। সেই সঙ্গে চিকিৎসা বাতিল করার অপচেষ্টা।

কী করবে ভেবে পায় নি ডাক্তার।

মরবে জানা কথাই।

যথাসময়ে যথানিয়মে মানুষ মরবে, সেটা ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই।

আরও তিন-চার বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারত। সেটা সম্ভবপর ব্যাপার।

অর্ধেন্দু সে-ই চেষ্টাই করেছিল।

ইনজেকশন দিয়েছিল একুশটা।

তবু চন্দ্রনাথ মরে গেল, হার্টফেল করে।

অর্ধেন্দু ছুটে আসে।

মৃতদেহটা পরীক্ষা করে।

বলে, ব্যাপার তো ঠিক বুঝতে পারছি না। হার্ট তো ভালোই দেখে গিয়েছিলাম।

শান্তিলতা বলে, চলেই তো যেতেন—কেবল দু-এক বছর আগে-পরের ব্যাপার।

অর্ধেন্দু বলে, না দু-এক বছর বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের কাজ। হঠাৎ কেন হার্টফেল হল বুঝতে পারছি না। বুঝতে না পারার দোষটা আমার।

রোগটা গোড়ায় ছিল এক রকম। বাড়তে বাড়তে একেবারে অন্য দিকে মোড় নিল।

ভালো মানুষ, সুস্থ মানুষ, খায়-দায়, সংসার চালাবার ধান্দায় নানান তালে ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ এক-একদিন গুম মেরে গিয়ে ঘরের দক্ষিণের কোণটিকে আশ্রয় করে, কেউ টেনে বার করতে পারে না।

স্নান নেই, আহার নেই, মুখে একটি কথা নেই। স্থির হয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে কঠিন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ হয়তো রাতদুপুরে কলতলায় গিয়ে হুড়হুড় করে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে শুরু করে। মুখ থেকে লম্বা লম্বা স্বস্তির আওয়াজ বেরোয় · আ—ঃ, আ—আ—ঃ!

দু দিন কি তিন দিন মানুষটা এই রকম একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। তারপর ঘোরটা কেটে যায়। আবার সহজ সুস্থ মানুষ।

কখনও কখনও পাগলামিটা আবার অন্য রূপ নেয়।

হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কাউকে কিছুই বলে না। দু রাত্তির তিন রাত্তির পরে বাড়ি ফিরে আসে উস্কোখুস্কো চুলে, কাদামাখা পায়ে।

বলে,—তুই আমার জন্যে খুব ভাবিস নি তো শান্তি? মাঝেমাঝে মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে যায় জানিস, কাউকে ভালো লাগে না। চেনা মানুষগুলোকে তো আরও না। তোকেও না।

শান্তির কাছ থেকে সাবান চেয়ে নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে

সর্বাঙ্গ ঘষে ঘষে স্নান করে। তারপর বেশ পরিপাটি করে চুলটি আঁচড়ায়। যা জোটে তাই দিয়েই দুটি খেয়ে নেয়।

খেতে খেতে বলে :

—আমি কি আগে এমন ছিলাম রে শান্তি ?

—না তো।

—হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রে শান্তি, কোথাও যেন থই পাচ্ছি না! এতদিন ধরে যা শিখেছি যা বুঝেছি, এই শহরের সঙ্গে দেখি তার কিছুই খাপ খায় না।

এক দিন সব কথা তোকে বলব। তোকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব ?

শান্তিলতা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে শোনে। কিছু বলে না। ভাবে।

সেদিন শনিবার। বস্তির মুখে ভুজঙ্গ সাহাদের বাড়িতে ছিল শনিপুজোর নেমন্তন্ন।

রাতে আর উনুন জ্বালে নি শান্তিলতা। পেট পুরে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে সন্ধ্যার পরই ঘরে আগল দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘণ্টা-খানেক এপাশ-ওপাশ না করার আগে তার ঘুম আসে না। কিন্তু সেদিন কী হল কে জানে, বালিশে মাথা ঠেকাতেই রাজ্যের ঘুম যেন ভেঙে এল শরীরে।

রাত তখন প্রায় দেড়টা, শান্তিলতার ঘরের শিকল ঝনঝন করে বেজে উঠল :

—শান্তি, ওঠ! দেখ, কে এসেছে!

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে শান্তিলতা।

ঘুমভাঙা কানে চন্দ্রনাথের গলার স্বরটুকুই সে শোনে। আর কিছু কানে ঢোকে না।

সলতেটা উসকে দিয়ে খিল খুলে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। এলো খোঁপা খুলে গিয়ে চুলগুলো এলোমেলো ছিটোনো। আঁচল-খানা বাঁ হাত বেয়ে ঝুলে পড়েছে। মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার ধূসর আলো বুকের কালোর সঙ্গে মিশে বোতামখোলা জামার ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত অচেনা এক চাপা রঙের আভা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

দুই পাল্লায় দুই হাত রেখে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তিলতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চন্দ্রনাথের মুখের প্রত্যেকটি ভাঁজকে চিনে নিতে চায় যেন।

তারপর আস্তে আস্তে ঘুমভাঙা ভারী গলায় বলে :

—হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসো। দাঁড়াও, গামছাটা এনে দিই।

কব্জির ওপর দিয়ে গামছাখানা ঝুলিয়ে হাতে সাবান নিয়ে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠের ওপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শান্তিলতা। তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারে ফেটে পড়ে :

—বাবা!

দরজার দিকে মুখ করে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে

সুখেন্দু। খাকি শার্টের সব কটা বোতাম খোলা, আস্তিন দুটো গুটিয়ে কনুয়ের ওপরে তোলা। পায়জামার কিনার দুটো হাঁটুর উপর উঠে এসেছে, পেছনে উলটনো চুলের ছোট ছোট দুটি গুছি ভুরুর ওপর এসে পড়েছে।

সুখেন্দু মুখ তুলে ফালি আকাশটার দিকে চেয়ে ছিল। চিৎকারে চমকে উঠে মুখ নামিয়ে শান্তিলতার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—বাবা! একবার এদিকে এসো!

এইবার সাড়া দেয় চন্দ্রনাথ :

—কী হল? ও তো সুখেন্দু। আমাদের আপনার লোক। তুই আমায় গামছাখানা দিয়ে যা। সাবান থাকলে দিস।

সাবান, গামছাটা কলতলায় রেখেই এক দৌড়ে ঘরে ঢোকে শান্তিলতা। চুপ করে বসে থাকে। শোনে কলতলায় হুড়হুড় করে জল ঢালার শব্দ।

ঘর থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে :

—এই রাতদুপুরে চান কোরো না বাবা। বুঝেছ?

চন্দ্রনাথ শোনে কিনা কে জানে, জল ঢালার শব্দ কিন্তু থামে না। ঘর থেকে বেরোতে সাহস পায় না শান্তিলতা। সুখেন্দুকে ও ভয় পেয়েছে। মাথার বালিশটাকে বুকে চেপে সর্বাঙ্গ টানটান করে বসে থাকে।

ঘরে ঢোকে সুখেন্দু। শান্তিলতার দিকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসে। বলে :

—খাবার জল কোথায়? জল খাব।

বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে কলসীটা দেখিয়ে দেয় শান্তিলতা। কলসীটা হালকা।

নাড়া দেয়। শব্দ নেই। একদম খালি। কলসীর কানাটা দু আঙুলে ধরে, সুখেন্দু বেরিয়ে যায়।

মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে চন্দ্রনাথ। নিজের থেকেই বলে চলে :

—আমাদের পুকুরের পশ্চিম দিকের পোড়ো ভিটেটার কথা মনে নেই তোর? ওইখানে থাকত পরেশ। আমরা দুজনে খুব বন্ধু ছিলাম। সুখেন্দু পরেশেরই ছেলে। পরেশ অনেক আগেই দেশ ছাড়ে। আসামে ব্যাবসা করত। আজ সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে হঠাৎ সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ধরে নিয়ে এলাম। ছেলে ভালোই।

—কে যে তোমার ভালো, কে মন্দ, আমি বুঝি না বাপু! এখন উনুন ধরাতে হবে কিনা বলো।

—না রে, আমরা খেয়ে এসেছি হোটেলে। ও-ই ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। খুব খাইয়েছে সুখেন্দু। মাছ, মাংস, দই, সন্দেশ পেট পুরে খাইয়েছে।

আজ রাত্রে ও এখানেই থাকবে। আমাদের দুজনের একটু শোবার ব্যবস্থা করে দে এই দক্ষিণের কোণটায়।

বিমল পড়ছে। এক ঘুমের পর যখনই শান্তিলতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখে বিমলের টেবিলে আলো জ্বলছে। রাত দুটো-তিনটের আগে বিমল শুতে যায় না। রাত জেগে পড়ে। বলে, রাতে মাথাটা সাফ থাকে বেশি।

বিমল ইতিহাস পড়ছে—'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। সামাজিক ইতিহাসের বই। বইটার নাম ও জানত, আজই প্রথম হাতে এল।

ট্রামে বসে-বসেই বিশ-পঁচিশ পাতা পড়ে ফেলেছে। সব বোঝে নি। ইংরিজী বিমল ভালো বোঝে না। তবু ইংরিজী বই-ই পড়বে। অভিধান হাতড়ে শক্ত শক্ত কথার মানে টুকে টুকে বিশ মিনিটে এক পাতা পড়বে—তবু সে ইংরিজীই পড়বে।

হঠাৎ বই উলটে রেখে বিমল উঠে দাঁড়ায়।

বাইরে তখন অশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ চলেছে। তিন দিন একটানা বৃষ্টির জের চলেছে বলা যায়। হয়তো বিরাম ঘটেছে দু-এক ঘণ্টা, নিশ্বাস ফেলার অবকাশটুকুর মতো।

সন্ধ্যার পর ঘণ্টা কয়েক একটু মন্দা লেগেছিল, তারপর আবার গাদাগাদি-করা নতুন ধূসর মেঘে আকাশ অন্ধকার করে এসে তোড়ে নেমে পড়ল কী প্রচণ্ড ঝমঝম বৃষ্টি!

গরাদের উপর মুখ চেপে বিমল দাঁড়িয়ে থাকে। শান্তিলতার

মনে হয় বিমল কিছু একটা ভাবছে। নানান কথা ভাবছে। নানান ভাবের মেশালে সে মুখের রূপ অবর্ণনীয়। কারণ মেশাল ভাবের তন্ময়তা, তুলির টানে রঙের গুণে ফোটানো গেলেও, কথায় তাকে ধরা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে আবার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে বিমল। ইতিহাসের বইখানা যত্ন করে তুলে রেখে র‍্যাক থেকে আর-একখানা বই পেড়ে নিয়ে বসে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'।

পাতা উলটে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্বন্তরের বর্ণনা পড়তে আরম্ভ করে :

'১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু কোন লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা। আজ সব নীরব।'

দু পাতা পড়ার পর তাও আর ভালো লাগে না। আলো নিভিয়ে দেয়। হাতের মুঠোয় গরাদ দুটো ধরে কালিঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

শান্তিলতার জানলা থেকে আকাশের সরু একটা ফালি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

বিমলের জানলার আকাশ তার চেয়ে অনেক বড়ো।

টিনের চালের উপর টিপটিপ বৃষ্টির মৃদু ঐকতান বস্তির মানুষ-গুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

শুধু সুখেন্দু ঘুমোতে পারে না।

সুখেন্দু এ বস্তির মানুষ নয়। সুখেন্দু থাকে ঘুঘুডাঙার বিলপারের বস্তিতে।

ওর খুপরির খোলা জানলা দিয়ে সিগন্যাল পোস্টের লাল-সবুজ আলো এসে ঢোকে, মেটে দেওয়ালের উপর কত কিম্ভূত রূপ ধরে দোলে। এঞ্জিনের শিটির তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার অন্ধকারকে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

এ বস্তির চাপা অন্ধকারে সুখেন্দু ঘুমোতে পারে না।

এলোমেলো ভাবনা নিয়ে জেগে থাকে।

হঠাৎ সুখেন্দু উঠে দাঁড়ায়।

ছোট জানলাটার দিকে এগিয়ে যায়। একটু তাজা বাতাস তার চাই।

একটি মুখ সে দেখতে চায়—যে মুখে শান্তি আছে, স্বপ্নের আভাস আছে, সুখের আশ্বাস আছে।

শান্তিলতার পায়ের নীচে হাঁটু গেড়ে বসে সুখেন্দু। অনড় হয়ে বসে থাকে।

তেলের অভাবে ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গেছে। রাস্তার গ্যাসবাতির কয়েকটা ক্ষীণ রেখা তেরচা ভাবে জানলা পার হয়ে শান্তিলতার কালো চোখের পাতার উপর, বাঁ দিকের গালের উপর, গলার খাঁজের উপর এসে পড়েছে।

সুখেন্দু উঠে গিয়ে শিয়রের ধারে বসে। ডান হাতখানা একবার

উঠে আসে মাথার উপর, তারপর যেন হঠাৎ চমকানি খেয়ে হাত-খানাকে গুটিয়ে নেয়। উঠে গিয়ে পায়ের নীচে বসে। হাতখানাকে আস্তে আস্তে পায়ের উপর রাখে। রেখে চুপ করে বসে থাকে। শরীরটাকে আরো একটু এগিয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই চাপা একটা আর্তনাদ করে পিছনে ছিটকে গিয়ে পড়ে সুখেন্দু।

শান্তিলতাকে দিনের আলোয় কখনও দেখে নি সুখেন্দু। তার পায়ে এত জোর সে বুঝবে কী করে।

তখন ঠিক ভোর হয়েছে বলা যায় না। চাঁদের আলো ফ্যাকাশে হয়ে এলেও ভোরের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় নি। সূর্যেরই আলো—চাঁদের গা থেকে ঠিকরে আসা আর সিধে আসা, তফাত তো শুধু এইটুকু। তবু কত তফাত।

অন্য দিন এমন সময় থেকেই রাস্তায় কলের জলে ভিড় জমতে শুরু করে। সারি সারি নানান মাপের বালতি আর কলসীর নিঃশব্দ মিছিল দাঁড়িয়ে যায়।

বস্তির মেয়েপুরুষরাই সংখ্যায় বেশি। বাবুদের বস্তিঘেঁষা নতুন কলোনি থেকেও দু-চার জন আসে। কলোনি থেকে রাস্তার কলে নিরুপায় হয়ে ধন্না দিতে আসে শুধু লুঙ্গিপরা, গেঞ্জি-গায়ে বা গামছা-জড়ানো বেপরোয়া পুরুষরাই নয়, মাঝবয়সী বিধবারাও আসে। মোটা থান পরনে, একবারে কোরা অবস্থা থেকে একবারও

খোপ না দিয়ে মাঝে মাঝে সাবানকাচা করার ফলে একটা হলদে-হলদে ময়লা রঙ পাকা হয়ে পড়ে গেছে। এদের স্তিমিত ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে গোড়ার দিকে কেমন একটু মায়া অনুভব করত বস্তির মজুর মেয়ে-পুরুষের দল।

আজকাল আর করে না। ওরা ভীষণ ঝগড়াটে। লাইনে জায়গা নিয়ে বালতি কলসী ভরে নিয়ে নিয়ম ভেঙে চট করে একটু চানও করে নিতে চেয়ে গলা ছেড়ে ওরা কোঁদল করে।

এ পক্ষের দাবির জবাবে ও পক্ষের পালটা দাবিতে কোলাহল এক-একদিন যখন চরমে ওঠে, বিমলকেই ছুটে আসতে হয় সালিসি করতে। বিমল অবশ্য বস্তির দিকে টেনেই রায় দেয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই। তবু তাকে চটাতে সাহস পায় না কলোনির বাবুরা,—বউঝিরা। আপদে বিপদে দায়ঝক্কি সামলাতে বিমলের মতো সহায় ওদের আর কেউ নেই।

শহরতলীর এই মানুষগুলির চোখের সামনে কয়েক মাসের মধ্যে ভোজবাজির মতো প্রায় এক ধাঁচের ছোট ছোট দালানের কলোনিটা গড়ে উঠেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে গোটা কতক কুঁড়ে, তিনটে ডোবা পুকুর, কয়েকটা বাঁশঝাড় আর ছোটো একটা মহিষের খাটাল।

লোকে বলে রসিকবাবুর কলোনি, কিন্তু আসলে সবাই জানে মারোয়াড়ী ভগবানদাসের টাকাই, অবস্থা আঁচ করে ডোবা ভরিয়ে, বাঁশঝাড় কচুবন কুঁড়ে খাটাল উচ্ছেদ করে, সস্তা ওঁচা সুরকি সিমেণ্ট দিয়ে নীচু ভিতে রগ্ন করা দালানগুলি তুলেছে—পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর গৃহত্যাগী, গৃহের জন্য উন্মাদ মানুষদের ঘাড় ভেঙে মোটা মুনাফা লুটেছে। এরা সব ধনী নয়তো অবস্থাপন্ন জোতদার, মহাজন,

ব্যবসায়ী, চাকুরে—যে দামেই হোক, একটা বাড়ির মালিক হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসাটাই ছিল এদের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম প্রয়োজন। অনেকেই আবার বাড়ির একাংশে ভাড়াটে বসিয়েছে, অন্তত একখানা ঘরে, কিছু আয়ের জন্য।

ভাড়াটেরা সব অল্প সঞ্চয় নিয়ে আসা উদ্‌বাস্তু।

এই কলোনির মুখোমুখি রাস্তার ওপারে একটুকরো পোড়ো জমিতে আর একটা কলোনি উঠেছে। পুতুলের খেলাঘরের মতো কয়েকটা হোগলার চালা, প্রায় মাথাসমান উঁচু, লম্বা হয়ে শোওয়া যায় প্রায় এ রকম লম্বা, তিন-চার জন পাশাপাশি শোওয়া চলে তেমন চওড়া। এটা তাদের কলোনি, বন্যার কুটোর মতো দলে দলে ভেসে এসে যারা চারিদিক আটকে গেছে—বস্তিতে, রোয়াকে, রাস্তায়, গাছতলায়।

এত ভোরে বিমলের ঘুম ভাঙে না। কিন্তু এক-এক দিন হঠাৎ কী এক অস্বস্তি উঠে ওকে ক্রমাগত খোঁচা দিতে থাকে। তন্দ্রার মধ্যেও সেই খোঁচার ধার বেশ টের পায়—অনবরত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘুম না ভাঙিয়ে, উঠে না বসিয়ে, ওকে রেহাই দেয় না।

জলকলের সামনের খোয়া-ওঠা রাস্তাটায় লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করতে করতে বস্তিতে ঢোকবার গলির মুখটায় এসে এক একবার দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল। হঠাৎ কী মনে হতে হনহন করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। মিনিট তিনেক পরে বেরিয়ে এসে আবার বস্তির দিকে এগিয়ে যায়। হাতে দুখানা বই।

বিমল অর্ধেকটা রাস্তা এগোতেই বস্তির গলি থেকে দুটি মানুষ

বেরিয়ে আসে। একজনকে বিমল চেনে। চন্দ্রনাথ। সুখেন্দুকে তার চেনার কথা নয়।

ওরা বেরিয়ে দক্ষিণমুখো বড় রাস্তার দিকে সোজা এগিয়ে যায়। বিমলকে লক্ষ্যই করে না।

বই দুখানি হাতে নিয়ে বিমল আস্তে আস্তে চন্দ্রনাথের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা আধখোলা।

শান্তিলতা ঘরে আছে কিনা বুঝতে পারে না। একবার ডাক দেয়। কেউ সাড়া দেয় না। বিমল আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ঢোকে। চৌকির উপর গিয়ে বসে।

খানিক পরে ঘরে ফেরে শান্তিলতা। ওকে দেখে একটু অবাক হয়, কিছুটা বিরক্তও হয়তো:

—আপনি? এখন!

—তোমার বাবা এই সকালে কোথায় বেরোলেন?

—কাজে।

—ফিরেছেন তো কাল অনেক রাতে?

—হ্যাঁ।

—দুখানা বই আছে। রাখো। খুব ভালো বই।

হাত বাড়িয়ে বই দুখানা নেয় শান্তিলতা। বাক্সের মধ্যে রাখতে রাখতে বলে:

—আগের দুখানা নিয়ে যান। পড়া হয়ে গেছে।

—কেমন পড়লে?

—ও-সব কথা এখন থাক। আমার এখন কাজ আছে।

—তোমার বাবার সঙ্গে যাঁকে দেখলাম উনি কে?

—দেশের লোক।

—আগে তো কোনো দিন দেখি নি।

শান্তিলতা কোনো জবাব দেয় না।

বিমল উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগোতে এগোতে থামে :

—তোমার কিছু সওদা আছে নাকি ?

—না।

—সব আছে ?

—কাল রাত্রে বাবা সব সওদা করে এনে রেখেছেন।

—ও।

বিমল আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

বাক্স খুলে বই দুখানা নেড়েচেড়ে দেখে শান্তিলতা। দুখানা বইই আনকোরা নতুন। কেমন একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ওঠে বই থেকে। নাকের কাছে ধরে গন্ধ শোঁকে। পাতা উলটেপালটে ছবি দেখে।

যে দেশে দারিদ্র্য নেই, শোষণ নেই সেই দেশের মেয়েদের পরিতৃপ্ত সুখী জীবনের ছবি। অভাবমুক্ত নিশ্চিন্ত গার্হস্থ্য জীবনের ছবি।

দেখতে দেখতে কেমন যেন রাজভোলানো নেশা ধরে যায় শান্তিলতার।

চন্দ্রনাথকে নিয়মিত জীবিকার ভরসা দিয়েছে সুখেন্দু।

লড়াই থেমে গেলে ইছাপুর বন্দুক কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছে সুখেন্দু। শহরতলীর এক স্টেশনের গায়ে তার সাইকেল মেরামতের দোকান দু-তিন বছরের মধ্যেই বেশ জেঁকে উঠেছে। একা হাতে সব কাজ সামাল দিতে পারে না—একটি লোকও রেখেছে। হাতে তার এখন কিছু পুঁজিও জমেছে। তাই দিয়ে সে আরও বড় কিছু ফাঁদবার মতলব ভাঁজছে।

সুখেন্দু চায় চন্দ্রনাথ সাইকেলের দোকানে গিয়ে বসে। তাকে হাতেকলমে কিছু করতে হবে না। চন্দ্রনাথ শুধু তদারক করবে, মালপত্তরের উপর নজর রাখবে, টাকাপয়সার হিসাব রাখবে। এইভাবে অবসর পেয়ে সুখেন্দু আস্তে আস্তে একটা মোটর সারাইয়ের কারখানা গড়ে তুলবে। চন্দ্রনাথ যদি এ দায়িত্ব নেয় সুখেন্দু তার সব অভাব পূর্ণ করে দেবে।

শান্তিলতার ঘর থেকে বেরিয়ে বিমল যখন কলের এক পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায় তখন সেখানে জলের উমেদারদের বেশ বড় লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। খানিক দূরে রাস্তার ওপারে হাইড্রাণ্টের চোঁয়ানো জল লোটায় ভরে স্নান শুরু হয়ে গেছে। বস্তির ধারে ছোট

ডোবাটার জল সবুজ হয়ে গেঁজিয়ে উঠেছে। তার চেয়ে এই কাদাগোলা নদীর জল অনেক শুদ্ধ ও পরিষ্কার। রাত্রের বৃষ্টির স্পর্শে ভোরটা ঠাণ্ডা মিষ্টি লাগে খালি গায়ে। সারা আকাশ জুড়ে ছাড়াছাড়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ সমান গতিতে দ্রুত উত্তরে পাড়ি দিচ্ছে। চারিদিকে কাছে ও দূরে এলোমেলোভাবে উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি। ওগুলির তুলনায় রাস্তায় জলের কলের নলটা কত সরু। কিন্তু সারা এলাকায় যতগুলি চিমনি রাস্তায় বস্তিতে ততগুলি জলের কলও বুঝি নেই। উপোসী মানুষের জলের তেষ্টাও মেটে না। মুখ দিয়ে জল গিলে খাবার তেষ্টাটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গের যে শত রকম তেষ্টা আছে! কাপড়-গামছা বাসনপত্র ভালোভাবে ধুয়ে মেজে সাফ করার যে দরকারী সাধ আছে!

দাঁতন ঘষতে ঘষতে জলের কলে লাইন আর হাইড্রান্টের চোয়ানো জলে স্নানের চেষ্টা দেখে আকাশের দিকে চেয়ে থুতু ফেলে মোতিলাল। বিড়বিড় করে কী বলে সে-ই জানে। বোধহয় ওই উঁচোনো চিমনিগুলিকেই একটা অশ্রাব্য গাল দেয়।

মানুষটা ঢ্যাঙা। চওড়া বুকের পাঁজরগুলি ঠেলে উঠেছে। মুখভরা খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। মাথায় বড়ো টাক, টাকের বাড় ঠেকাতেই যেন কাঁচাপাকা চুলের বাঁধ দিয়েছে টাকটা ঘিরে!

মোতিলালের হাতে ছিল লোহার শিক বাঁকিয়ে ঘরে তৈরী নকল চাবি। খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে হাইড্রান্টের মুখটা খুলে দেয়। হাতের তালু দিয়ে হাইড্রান্টের মুখ চেপে সরু ধারায় ধীরে ধীরে জল তুলে লোটা ভরে রামসুখ স্নান করছিল। পা দিয়ে চেপে

মোতিলাল তোড়ে জলের তিনহাত উঁচু বাঁকা ফোয়ারা তুলে দেয়। রামসুখ এবার মনের সুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নান করে, ময়লা গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলতে চেষ্টা করে।

স্নানার্থী একজন বলে ওঠে :

—আরে রাম রাম, রামসুখ।

তেওয়ারী ব্রাহ্মণ রামসুখ নীচু জাতের একজনের পা-ধোয়া জলে স্নান করছে—মন্ত্র পড়তে পড়তে স্নান করছে। বেচারার কাঁচা শহুরে প্রাণটাকে এরা নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে।

মানুষটা মেটে রঙের, মাঝবয়সী। কপালে গতকালের চলকা-ওঠা চন্দন-তিলকের চিহ্ন। কব্জিতে গোটা তিনেক মাদুলি, ন্যাড়া মাথার টিকি থেকে ফুলটা খসে পড়ে গেছে কিন্তু গিঁটটা ঠিক আছে। পরনের নতুন আধখানা হেঁটো কাপড়টি কুচকুচে কালো।

মোতিলালও ওইভাবেই কাপড় পরে, একখানা কাপড় কিনে দু খণ্ড করে চালায়। কাপড়ের যা দাম!

মাত্র ক মাস আগে দেশ থেকে চাষবাস ছেড়ে কলকাতায় এসেছে শিউশরণ। সেও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-হৃদয়টি তার এই ক মাসে কত বার কতভাবে যে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম করেছে, কিন্তু বিদীর্ণ হয় নি। কারণ তার হৃদয়টাই ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখার চেয়ে প্রাণটা বজায় রাখা পছন্দ করেছে বেশি।

অভয়পদ দাসের স্থানীয় ছোটো কয়লার গুদোমটিতে সে কুলি খাটে—মুফতে। লরি ভরে চালান এলে কয়লা নামায়, খদ্দের এলে কয়লা মেপে দেয়—পাঁচ সের থেকে এক মণ পর্যন্ত এক-এক বারের মাপ। এজন্য মজুরি পায় না। পায় দু-বেলা আধ পো

হিসাবে আটা, ছটাক খানেক তরকারি আর ছুটি করে কাঁচা লঙ্কা। তার রেশন কার্ডের চিনি আর চাল অভয়পদর বাড়িতে যায়। সকালে বিকালে ফাউ পায় শিউশরণ—দু পয়সার ছাতু বা ছোলা। ভোর থেকে রাত আটটা নটা পর্যন্ত কয়লার গুদোমে এলোমেলো ছাড়াছাড়া ডিউটি।

বাড়তি খেটে তার রোজগার। পাঁচ দশ সের কয়লা যারা কেনে তারা নিজেরাই কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়। আধমণ একমণ কয়লার বস্তা খদ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সে মজুরি পায় দু আনা। বাঁধা রেট—খদ্দেরের বাড়ি এক মিনিটের পথই হোক আর দশ মিনিটের পথই হোক।

রামসুখ তার তিরস্কার শুনেও শোনে না বলে শিউশরণ ভীষণ রেগে আবার বলে :

—রাম রাম, রামসুখ।

তার ধিক্কার শুনতে শুনতে রামসুখ নির্বিচারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সরে দাঁড়িয়ে গা মুছতে থাকে। এমন স্বার্থপর সে নয় যে তোড়ে জল পেয়েছে বলেই আর সকলের স্নান ঠেকিয়ে নিজে সাধ মিটিয়ে স্নান করে যাবে—যদিও সে জানে আরও দু-তিন মিনিট জলের ফোয়ারাটা দখল করে থাকলেও কেউ কিছু বলত না বা ভাবত না।

রামসুখের হয়ে মোতিলালই এবার ধমকের সুরে শিউশরণকে বলে :

—ক্যা, পাগলা হো গিয়া ? গঙ্গাজল আছে না ?

—ওঃ, হাঁ। ঠিক বাত।

শিউশরণ যেন মুক্তি পায়, ইংরেজ রাজের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে বড়ো মুক্তি।

এতই সে স্বস্তি আর শান্তি আর আশ্বাস অনুভব করে যে অল্প-বয়সী মুসলমান ছোকরাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মোতিলালের পা-ধোয়া কাদাগোলা গঙ্গাজলের ফোয়ারায় স্নান করতে লেগে যায়। মনে হয়, মোতিলালের পায়ের চাপে হাইড্রান্ট থেকে বাঁকা হয়ে যে জলের ফোয়ারা উঠছে সেটা তাকে সেই ছবিটাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে: কোমরে গলায় সাপ জড়ানো, মোমের রক্তহীন পুতুলের মতো ধবধবে ফরসা, কোলে পুতুলের মতো ছোটখাট একটি মেয়ে বসানো, বটতলার সস্তা শিবের ছবি। হাইড্রান্টের মুখ থেকে তোড়ে-ওঠা জলের ঊর্ধ্বমুখী স্রোত আর ছবির সাপে-বাঁধা জটা থেকে উৎসারিত জলের ফোয়ারা—দুটো মিলে যেন এক হয়ে গেছে শিউশরণের চোখে।

কিন্তু জল পাওয়া তার এত সহজে হয় না। রামসুখ ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে:

—লাটসাহেবি চালাবে না হেথা, খবরদার। একজন যে নাইছে তাকে নাইতে দিয়ে তবে তুমি আসবে।

ক্রুদ্ধ শিউশরণ রুখে উঠে, বলে:

—হামি পহেলা এসেছি।

—নেহি। তুমি পয়লা আস নি। তোমার আগে সালেক এসেছে।

—হাঁ? তুম বলনেসেই হয়ে গেল? পুছো বিমলবাবুকো।

বিমল কথাটা শোনে কিন্তু আমল দেয় না। রামসুখও তাকে সাক্ষী মানতে সে মুখ খোলে:

—মিছিমিছি ঝগড়া করছ কেন ? একে একে নেয়ে নাও না।

কিন্তু তা কি হয় ? তোড়ে জল উঠেছে, ঝগড়ার মীমাংসা হতে হতে সালেকের স্নান হয়ে যাবে। কিন্তু সে হল ভিন্ন কথা। আপোসে একজন কেন দশজন তার আগে নেয়ে নিক। সে কিছু বলবে না। কিন্তু, অন্যায় সহ্য করবে কেন ? অবিচার মানবে কেন ? যতই সামান্য হোক সে অন্যায়, সে অবিচার। রামসুখ বলে, আরে বাবা, সালেক আগেই এসেছিল। চাবিটাতো চাই! না, চাই না? চাবি আনতে সালেককে মোতিলালের ঘরে ভেজেছিলাম। ভেবেছিলাম কি, মোতিলাল আজ ভোরে চান করতে আসবে না।

মোতিলাল বলে, হ্যাঁ, সালেক চাবি চাইতে গিয়েছিল। এক-সাথে আসছিলাম, দাঁতন খুঁজতে ও পিছিয়ে গেল।

তাহলে অবশ্য কোনো কথা নেই। তাকে ডিঙিয়ে নাইতে শুরু করেছিল ভেবেই সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। সালেক যদি সত্যিই আগে এসে থাকে তবে কাজটা তার অন্যায়ই হয়েছে বৈকি। তাকে ধাক্কা দিয়ে ধমক দিয়ে রামসুখ দোষই করেছে। মেঘ কেটে গিয়ে যেভাবে সূর্য বেরিয়ে আসে তেমনিভাবে পলকে শিউচরণের মুখের ক্রুদ্ধ ভাব কেটে যায়।

রামসুখ মোতিলালকে জিজ্ঞাসা করে, ভোরে চান করবে নাকি আজ ?

মোতিলাল আশ্চর্য হয়ে বলে, খাটতে যাব না ?

—খাটতে যাবে ? আজ ?

বিশ বছর ধরে মোতিলাল কারখানায় খাটতে যাচ্ছে, আজ কারখানার ছুটি বা ধর্মঘট বা শহরে হরতাল, এ-সব কিছুই

নেই তবু আজ মোতিলাল কাজ করতে যাবে শুনে রামসুখ যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার মুখ দেখে মোতিলালেরও ভাবনা লেগে যায় যে তার অজান্তেই হয়তো বা মস্ত ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে, যেজন্য আজ কাজে যাওয়াটা খুবই খাপছাড়া হবে।

—কী ব্যাপার রামসুখ? কী বলছ? কাজে যাব না কেন আজ?

—কোর্টে যাবে না? কাজে যাবে তো কোর্টে যাবে কী করে?

এবার মোতিলালের মুখের ভাব কঠিন হয়ে যায়।

—কোর্টে যাব? কোর্টে যাবার আমার দরকার কী?

—তোমার ছেলেকে হাজির করাবে না আজ?

মোতিলাল মাটিতে থুতু ফেলে দারুণ অবজ্ঞার সুরে বলে:

—হাঃ, কত হাজির করছে।

দাঁতনটা দাঁতে চিরে, মোতিলাল জিভ চাঁছে, মুখ ধোয়। একটা ফাঁকা লরি জোরে বেরিয়ে যায়। তবু রামসুখ দ্বিধাভরে খানিকটা যেন জিজ্ঞাসার সুরেই বলে:

—তবু একটা হুকুম যখন হয়েছে—

—হুকুম হয়েছে, তোমার শখ থাকে তুমি যাও। মিছিমিছি একটা দিনের মজুরি যাবে, বাসভাড়া যাবে, অত গরজ আমার নেই।

মোতিলালের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। বিচারক হুকুম দিলেই যে তার ছেলে আর তার সাথীদের আদালতে হাজির করাবে—সে বিশ্বাস করে না। বিনা বিচারে আটক বাতিল হবে না, এটা জানাই গেছে। কিন্তু বন্দীদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, এতেও মোতিলালের এমন সুনিশ্চিত অবিশ্বাস যে একদিনের মজুরি

আর বাসের পয়সা খরচা করে গিয়ে যাচাই করে আসতেও সে রাজী নয়।

জলের কলের লাইন থেকে একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে :

—মোতিলাল, কোর্টে যাবে তো ?

মোতিলাল চেঁচিয়ে জবাব দেয় :

—না।

তার জবাব শুনে কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লাইন ছেড়ে এদিকে এগিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বোঝা যায়, মোতিলালের জবাব তাদেরও রামসুখের মতোই বিচলিত করেছে।

কাছে এসে দু-তিনজন প্রশ্ন করে :

—যাবে না কি রকম ? তারিখ পালটেছে ? বিচার বাতিল হয়ে গেছে ?

আর একজন প্রশ্ন করে :

—তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে ?

এই সব প্রশ্ন শুনে মোতিলাল জ্বালা ও ব্যঙ্গ ভরা এক অদ্ভুত সশব্দ হাসি হাসে :

—ছেড়ে দিয়েছে বৈকি ! ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করাতে হাওয়াই জাহাজে মার্কিন মুল্লুকে পাঠিয়েছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্নকারীকে বলে :

—আমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে, তবে আর ভাবনা কী। আর কে শালা কোর্টে যায়। তাই কোর্টে যাব না ভাবছ বুঝি ?

প্রশ্নকারী লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি বলে :

—না না, তা ভাবি নি। তা ভাবব কেন? কথাটা মনে হল, তাই—

আর একজন বলে:

—যাক যাক, যেতে দাও। ব্যাপারটা কী মোতিলাল? যাবে না কেন? আমি তো ভাবছিলাম যাব। দেখে আসব কী হয়।

মোতিলাল বলে:

—ব্যাপার কী আবার। ব্যাপার কিছু নেই। কিছুই হবে না জানি তো, ফের গিয়ে কী করব? শুধু আইনের ম্যারপ্যাঁচ নিয়ে কচকচি হবে খানিক, কানাকড়ি মানেও ঢুকবে না মাথায়। কাজ কী বাবা ঝকমারিতে।

—কী করে জানলে তোমার ছেলেদের আনবে না?

—কী করে আনবে? সাহস পাবে কোথায়? কী তাদের দরকারটা আনবার? কোর্টে যদি আনবে, বিচার যদি করবে, বিনা বিচারের কানুন করেছে কি শখের জন্যে, ধুয়ে জল খাবে বলে?

প্রায় ষাট বছরের বুড়ো পটল প্রথম কথা বলে। বাঁধা সুতোটার কাছ পর্যন্ত পোড়া বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, দুবার কেশে, ধীর স্বরে সে বলে:

—আমি বলি কি, আইনমতে সমনটমন বেরিয়েছে, ওদেরই জজ আদালত, ওদেরই নিয়মকানুন, তাই হয়তো বা—

মোতিলাল হেসে বলে:

—কোথায় আছ দাদা? ভাবছ বুঝি ইংরেজ আমল শেষ হয়ে গেছে, সত্যযুগ এসে গেছে? আগে ঘাড়ে ছিল শুধু ইংরেজ; এখন ইংরেজ মার্কিন ডবল ভূতের পালা। যার সৈন্য যার পুলিস, তার

আইন তার আদালত। নিজের আইনের ফাঁদে পড়লে, জজ-আদালতের রায় মুশকিল করলে, কাল ফের একটা আইন করে জজ-আদালত তুলে দিতেই বা কতক্ষণ!

জলভরা বালতি হাতে নিয়ে পীতাম্বর এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ খোলে :

—যা বলেছ মাইরি! লোকে বলে ভদ্দরলোকের এক কথা। এ কেমন এক কথা রে বাপু ভদ্দরলোকের? এদিকে বিচারও রইবে, বিচার ছাড়া আটকের আইনও রইবে। রাখবি তো একটা রাখ। খুশি হয় বিচার-টিচার সব তুলে দে। বিচার রইলে বিনা-বিচার রয় কোন্ বিচারে?

মোতিলাল বলে :

—ইংরেজ-মার্কিনের লেজ ধরে স্বাধীন হলে সবই হয়। এ বাবা স্বাধীন মার্কিন বিচার।—এ শিউশরণ, তোমার তো ভাই টাইমের কাজ নয়। আমি আগে নেয়ে নিই?

—হাঁ, হাঁ—জরুর।

স্নান শেষ হতে হতে মোতিলাল টের পায়, জলের কলের লাইনে একটা গোল বেধেছে। চেঁচামেচি তার কানে আসে। লক্ষ্মীর মা কজনের সঙ্গে লাইন ছেড়ে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে। লক্ষ্মীর মার পরিচিত তীক্ষ্ণ ও চড়া গলার আওয়াজ তার কানে আসে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাছে গিয়ে দেখে, লাইন ছেড়ে যারা তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গেই লাইনের অন্য কয়েক জনের ঝগড়া বেধেছে। লাইনের যেখান থেকে যে দু মিনিটের

জন্য সরে গিয়েছিল, ফিরে এসে এবার আবার সেইখানে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু কয়েকজন তাদের এ দাবি মানতে রাজী নয়। তারা বলেছে, এবার এদের দাঁড়াতে হবে সকলের পিছনে।

কারণ, তাই-ই নিয়ম। জলার্থীদের রাস্তায়-দাঁড়ানো পার্লামেণ্টের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন।

অনেকটা বিমল আর মোতিলালের চেষ্টাতেই আইনটা পাশ হয়েছিল। শুধু লাইনে দাঁড়ানোর নিয়ম নয়, অন্যান্য ধারায় একজন ক-বালতি জল পাবে, কখন খাবার জল নেওয়া ছাড়া মুখ হাত ধোওয়া পর্যন্ত চলবে না, কখন চলবে—এ সব বিষয়ে নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সকলে স্বীকার করেছে নিয়ম মেনে চলবে।

নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক এসে কলে ভিড় করত। বস্তি থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ দোকানপাট ঘরবাড়ির আনাচ কানাচ উদ্‌বাস্তুতে ভরে যাবার পর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়—বিশেষ করে এই ভোরের দিকে। প্রতিদিন হাতাহাতির উপক্রম হত, ছোটখাট ঝগড়া বেধেও যেত প্রায়ই। ভোরে মজুর বেশি হাজির থাকায় মারামারিটা গড়াত না, অল্পেই থেমে যেত।

বিমলই একদিন সকলের জন্য এক রকম নিয়ম চালু করার কথা বলে, মোতিলাল খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বালতি কলসী বসিয়ে রেখে, এমন কি আগের রাত্রে ভাঙা মাটির কলসী বসিয়ে লাইনে জায়গা দখল করে রাখা নিয়েই ঝগড়া হত সবচেয়ে বেশি। তাই নিয়ম হয়, লাইনে যে হাজির থাকবে তারই জল নেবার অধিকার—বালতি-কলসীর নয়। লাইন ছেড়ে চলে গেলে ফিরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

এই নিয়মের ব্যাখ্যা আর প্রয়োগ নিয়ে আজ গোল বেধেছে।

আর একটা নিয়ম হয়েছিল, ভোরে একজন এক বালতি বা এক কলসীর বেশি জল পাবে না। সাতটার পর দু বালতি বা দু কলসী।

পরদিনই ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ফকিরচাঁদ পাঁচটি বাচ্চা, দুটি বড় কলসী আর চারটি বড় বালতি নিয়ে হাজির—বোধ হয় প্রতিবেশীর কাছে ধার করে। বাচ্চাগুলি তার নিজের।

ঝগড়া আরম্ভ করেছিল লক্ষ্মী। সকলে তার পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু ফকিরচাঁদ কিছুতে মানবে না যে নিয়ম ভেঙেছে। একজনের এক বালতি—সে তো বেশি চাইছে না। বাচ্চারা কি মানুষ নয়?

অন্য কয়েকজনও ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ফকিরবাবুর মতো অতটা চালাক কেউ হতে পারে নি। তখন নিয়ম হয়, প্রত্যেকের জন্যে এক বালতি বটে, কিন্তু সে এমন বালতি হবে যা সে নিজে বইতে পারে। ফকিরবাবু হম্বিতম্বি করেছিল অনেক, কিন্তু সকলে মিলে যে নিয়ম করেছে তা না মেনে উপায় কী! কলোনির দু-তিন জন ভদ্রলোকও তার বিপক্ষে দাঁড়ায়।

আজ সেই ফকিরবাবুই চেঁচাচ্ছে বেশি।

—যা নিয়ম আছে তা মানতে হবে। তোমরা কোন্ লাটসাহেব যে খুশিমতো নিয়ম ভাঙবে? চলবে না ও সব। পিছনে দাঁড়াতে হবে তোমাদের—সবার পিছনে।

লক্ষ্মী আকাশচেরা গলা শেষ পর্দায় তুলে বলে:

—আরে মরণ মোর। নিয়ম ভাঙলাম কিসে? দু-পা গিয়ে দু-দণ্ড একটা লোকের সাথে কথা কয়েছি, তাতে লাইন ছেড়ে যাওয়া হল কোন্খানটায়? একটা বুড়ো মানুষের জোয়ান ছেলেটা

কতকাল বিনা বিচারে আটক রয়েছে, আজ নাকি তার বিচার হবে সবার সাথে, বাপটাকে দেখে দুটো কথা শুধিয়ে না এসে থাকতে পারে মানুষ? তাতেই লাইন ছাড়া হল? এ কোন্‌দেশী বিচার গো মা! তুমি যে নর্দমায় জল করতে যাও, সেটা লাইন ছাড়া হয় না? পিছনে দাঁড়াও না কেন জল করে এসে?

মোতিলাল কাছে এলে লক্ষ্মী বলে:

—ও মোতিলাল, একটা বিচার করো।

ফকিরবাবু বলে:

—মোতিলাল আবার বিচার করবে কি! বিচারের কী আছে! লাইন ছেড়ে চলে গেলে পিছনে দাঁড়াতে হবে—সোজা কথা।

কিন্তু মোতিলালকে এত সহজে বাতিল করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ যারা চুপ করে ঝগড়া শুনছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না কোন্ পক্ষের যুক্তি সার্থক, তারা বলে:

—না না, মোতিলাল কী বলে শোনা যাক।

দেখা যায়, যারা ফকিরবাবুকে সমর্থন করেছে তাদের মধ্যেও কয়েকজন মোতিলালের কথা শুনতে ইচ্ছুক।

মোতিলাল গামছা দিয়ে মুখ মুছে ফকিরবাবুর দিকে চেয়ে বলে:

—মোরা হেথা বেশির ভাগ গরিব মানুষ বাবু, খেটে খাই।

মোতিলাল একটু থামে। সকলে চুপ করে শোনে। কলে জল এসেছে, বসানো বালতিতে জল পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

মোতিলাল বলে:

—মোরা এঁটো কথা গিলি না বাবু, বমি করে খাই না।

সে আবার একটু থামে। বোঝা যায়, ফকিরবাবু বেশ একটু

অস্বস্তি বোধ করছে। মোতিলাল তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে। বলে :

—মোরা দশজনে মিলে যে নিয়ম করেছি, নিয়মটা মোদের মানতে হবে। কেউ তো খুশিমতো নিয়ম মোদের ঘাড়ে চাপায় নি—মোদের কী বলার আছে না জেনেই! তোমাদের কিন্তু লক্ষ্মী পিছনে দাঁড়ানো উচিত। মোদের নিয়ম মোরাই যদি না মানি তো মানবে কে?

লক্ষ্মী নরম সুরে প্রতিবাদ জানায় :

—বিনা বিচারে আটকের বিচারটা কী ব্যাপার একটু জানতে গেলাম—

মোতিলাল মাথা নেড়ে বলে :

তা বললে চলবে কেন? লাইন ছেড়ে না গেলেই হত। আমি এখান দিয়ে যাবার সময় শুধোতে পারতে, ঘরে গিয়ে জানতে পারতে। জরুরী বলে যদি লাইন ছেড়ে না গিয়ে পার নি, তার দামটুকু দিতে হবে না?

বুড়ো পটল বলে :

—ঠিক কথা।

বলে, সে বালতি হাতে লম্বা লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য পা বাড়িয়েছে, জোয়ানবয়সী খলিল তার হাত ধরে লাইনে নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয় :

—আমার তাড়া নেই, পিছনে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, তোমার কষ্ট হবে।

খলিল ছিল চারজনের পিছনে।

লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়ানো শান্তিলতা ডেকে বলে :

—অ লক্ষ্মীদিদি, তুমি বরং আমার জায়গায় এসে দাঁড়াও। মেয়েটার জ্বর কমে নি, না ?

যারা মোতিলালের সঙ্গে কথা কইতে লাইন ছেড়েছিল তাদের উদ্দেশ করে সাধারণভাবে আরেকজন বলে :

—তোমাদের কারও যদি তাড়া থাকে ভাই, আমার জায়গায় এসে দাঁড়াও।

বিমল এতক্ষণ মুখ বুজে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। কখন যে সে আস্তে আস্তে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল, শান্তিলতা ছাড়া আর কেউ তা লক্ষ্য করে নি।

চন্দ্রনাথ সেই কাকভোরে বেরোবার সময় বলে গিয়েছিল :

—আজ দুপুরেই ফিরব। বাড়িতেই খাব।

রাত আটটা। এখনও চন্দ্রনাথের দেখা নেই।

অসহ্য গুমোট গরম। ঘরে এক দণ্ডও তিষ্ঠনো যায় না। শান্তিলতা দাওয়ার খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে একফালি ময়লা আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

পাশের ঘরে রেবতী আর তার মামীর ফিসফিস গুঞ্জন মাঝে মাঝে কানে আসছিল কিন্তু মনে পৌঁছচ্ছিল না।

হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ল রেবতী :

—ভগবান! ভগবান! ও নাম আর আমার কাছে কোরো না। ঘেন্না ধরে গেছে ও নামে!

একটু থেমে আবার ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে:

—কত ডেকেছি ভগবানকে। আকুল হয়ে কত কেঁদেছি ভগবানকে ডেকে। তবু আমার এই হাল!

মিত্তিরদের ছোট বউয়ের আজ সাধ। মিত্তিরদের বাড়িতে ছেলে পড়ায় রেবতীর মামা। বড় বউ ঝিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, মাস্টারের বউ আর তার ভাগনী যেন সন্ধ্যায় আসে।

রেবতী যাবে না। সে মামীর বিছানায় চিত হয়ে পড়ে থাকে।

—মাসে মাসে কী হয় মোর জান না? জানবে কেন? ভারি মোর মামার বাড়ির দরদ। ব্যথা-বেদনায় মরে যাব, তাকিয়ে দেখবে না। শুধু ঢঙ করবে আর গঞ্জনা দেবে—

বলার কী ভঙ্গী!

যেন কেউটে সাপ ফুঁসছে।

রানী-সাপ গোখরানীর মতো ফণা তুলে হেলেদুলে নয়—কেউটের মতো ছোবল মারে আছড়ে আছড়ে।

মামী তাড়াতাড়ি সুর পালটে বলে:

—এ পুজোটা কাটুক। পুজোর পর—

—পুজোর পর কী?

মামীর জবাব আর শান্তিলতার কানে পৌছল না।

রেবতীর মামীর ক্ষীণ স্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে এক অচেনা ভারী, কর্কশ পুরুষকণ্ঠের আওয়াজে চমকে উঠে ফিরে তাকাল শান্তিলতা।

—চন্দ্রবাবুর ঘর কোনটা?

মধ্যবয়সী দুজন লোক পাঁজাকোলা করে চন্দ্রনাথকে নিয়ে আসছে।

শান্তিলতা উঠানের মাঝখানে এগিয়ে আসে।

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করে :

—চন্দ্রনাথবাবুর মেয়েকে একটু খবর দিতে পার?

অচৈতন্য চন্দ্রনাথকে তার সেই অন্ধকারেও চিনতে দেরি হয় না। আস্তে আস্তে বলে :

—আমিই তাঁর মেয়ে। এই ঘরে নিয়ে আসুন।

লোক দুটি ঘরের ভিতর গিয়ে চন্দ্রনাথকে আস্তে আস্তে চৌকির উপর শুইয়ে দেয়। তারপর খানিকক্ষণ শান্তিলতার মুখের উপর বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে :

—বুড়ো মানুষ, ঝোঁকের মাথায় নেশা করে এই কাণ্ড। ভয় নেই কিছু। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে। এখন ঘুম ভাঙাবেন না।

শান্তিলতা চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

লোক দুটি আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। বলে :

—আমরা এখন তাহলে যাই। সুখেন্দু কাল সকালে এসে খোঁজ নেবে বলেছে। হ্যাঁ, এই টাকা কটা ধরুন। বাবুর পকেটে ছিল।

শান্তিলতা ঘরের ভিতর থেকে হাত বাড়ায়। তার হাতের উপর একটা রুমালের পুঁটলি তুলে দিয়ে ওরা উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

চন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে বসে শান্তিলতা। মাথায় হাত দেয়, নাকের সামনে হাতের তালুটা ধরে নিশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ নেয়।

গামছা ভিজিয়ে কপালটা মুখটা আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয়। পাখা এনে বাতাস করে মাথায়।

তারপর কী ভেবে উঠে পড়ে।

বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে শিকল তুলে দেয়। উঠোনে নেমে বিমলদের বাড়ির দিকে এগোয়।

কড়া নাড়তে, এসে দরজা খুলে দেয় ছেনি :

—কী ভাগ্যি, কী ভাগ্যি আমাদের, আপনার পায়ের ধুলো পড়ল আমাদের বাড়িতে!

বিমলের ছোট বোন ছেনি চোখেমুখে কথা কয়। পাকা-পাকা কথা। হাত নেড়ে নেড়ে কথা কয়, কচি দেহটা নেড়ে নেড়ে কথা কয়।

দেখে মনে হয় কিশোরী নয়। বালিকা কিশোরী হব-হব করছে।

এমনি দেখলে বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয় বুঝি রাস্তার সস্তা ভিখারিনী।

মনোযোগ দিয়ে দেখলে মনে হয়, একটা সুন্দর ফুল অকালে শুকিয়ে গিয়ে কুৎসিত হয়ে গেছে।

শান্তিলতা ঘরে ঢোকে না। খোলা কপাটের সামনে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করে :

—তোমার দাদা কোথায় ভাই?

—দাদা তো আজ দেরি করছে দেখছি।

—তোমার দাদা এলেই একবার আমাদের ঘরে যেতে বোলো আমার বাবার বড্ড অসুখ।

বিমল সেদিন বাড়ি ফেরে রাত সাড়ে নটায়।

রাস্তা জাম হয়ে গিয়েছিল। দুর্ঘটনায়।

দুর্ঘটনা অবশ্য হবার কথা নয়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল বিমল।

পাশেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি।

বেশভূষা থেকে, দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখেই টের পাওয়া যায় শহরের মেয়ে। অর্থাৎ নতুন আমদানী নয়; শহরে বসবাস চলাফেরা তার ধাতস্থ হয়ে গেছে। যার সহজ একটা মানে এই যে খুব বেশি রকম অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও শহরের রাজপথে চলার সময় তার অবচেতনা তাকে আপনা থেকেই কতকগুলি সতর্কতা পালন করায়।

নীচু-দরজাওয়ালা বাড়ির মানুষের যেমন কয়েকবার মাথায় ঠোক্কর খাবার পর ঠিক সময়ে মাথাটা নীচু করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়, সব সময়ে সচেতনভাবে খেয়াল রাখার দরকার থাকে না।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি হঠাৎ কোনো দিকে না তাকিয়েই সোজা রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগিয়ে যায়—সন্ধ্যার ঠিক মুখেই শহরের রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ির যে দুমুখী স্রোতটা পাশাপাশি বয়ে চলে, তারই কাছের স্রোতটার মধ্যে।

বিজ্ঞান অবশ্য বলে দিতে পারে কেন এ রকম ঘটে। নীচু দরজাটার কাছে হাজারবার মাথাটা নত হলেও কেন একদিন হঠাৎ অভ্যস্ত মাথাটা ঠোক্কর খেয়ে বসে, বছরের পর বছর দুদিকে তাকিয়ে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাটা ধাতে দাঁড়িয়ে গেলেও কেন সেই মানুষটাই একদিন হঠাৎ এভাবে চলন্ত গাড়ির স্রোতের মধ্যে নেমে যায়। বাস্তব ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ বলে দিতে পারে বলে তথা-কথিত ভুলের জন্য অথবা দোষের জন্য যে সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলি ঠেকাবার উপায়ও বিজ্ঞান বলে দিতে পারে।

কিন্তু শুনছে কে ?

মস্ত সেলুন গাড়িটা যেভাবে আসছিল তাতে মেয়েটিকে মেরে ফেলতে পারত। কারো কিছু বলার থাকত না। পিছনে গাড়ি, পাশে গাড়ি—এ অবস্থায় আত্মহত্যা করার জন্য কেউ যদি এভাবে চলন্ত গাড়ির ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রাণপণ ব্রেক কষেও গাড়িটা থামাবার সময় বা ফাঁক না রাখে, তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে লোকের আছে।

কিন্তু গাড়িও কিনা মানুষ চালায় এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোট এবং বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই ধাত কিনা মানুষের, দুর্ঘটনা তাই হয়ে দাঁড়ায় অন্য রকম।

দুর্ঘটনা ঠেকাবার উপায় ছিল না। সেলুন গাড়িটার মোটা বেঁটে কালো রঙের ড্রাইভারটি গাড়ির এবং নিজের খানিকটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে জোরে ধাক্কা দিয়েও প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষার সঙ্গে সঙ্গেই সে গাড়িটাকে ডাইনে

ঘুরিয়ে দেয়। গাড়ির ধাক্কায় মেয়েটি ছিটকে পড়ে ফুটপাথের দিকে, গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মারে চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা টানা আর্তনাদের মতো আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ির ব্রেক কষার।

সেলুন গাড়িটার পিছনে আসছিল পুরনো লম্বাটে আকারের একটি গাড়ি। ব্রেক কষে সেটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুন গাড়িটার উপর। ফলে পিছনের সীটের ডান দিকের কোণে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বসে ছিল, চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে সে পাশের তরুণীটির কোলে ঢলে পড়ে—সস্তা সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতোই।

সব গাড়ি থেমে যায়। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক লোকারণ্য সেখানে জমাট বেঁধে ওঠে।

কী বিরাট ছন্দে কী রকম আশ্চর্য মসৃণ গতিতে শহরের এই একটি রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কী বিচিত্রভাবে তাতে মেশানো ছিল নানা বিভেদ আর সামঞ্জস্য, ব্যাহত হয়ে থেমে যেতে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগে ছিল নানা আওয়াজের মেশাল দেওয়া একটানা গুঞ্জনধ্বনি, এখন তার চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে শুধু মুখর মানুষের কলরব।

কত অল্প সময়ের মধ্যেই যে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় রাজপথটা!

দুর্ঘটনা গুরুতর নয়। একজনও মরে নি, হাসপাতালে পরে কারও মরবার সম্ভাবনা নেই।

কয়েকজন আহত হয়েছে আর কমবেশি জখম হয়েছে খানচারেক

গাড়ি। বেশি চোট লেগেছে সেলুন গাড়িটার ড্রাইভার, আর যে মেয়েটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার। তবে তাদেরও মারাত্মক নয় কিছু। সেলুন গাড়িটার পিছনের সীটের ভদ্রলোকের মাথার পিছন দিকটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, একখানা হাত গেছে মচকে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ার আগেই পুলিশ ভিড়কে একপাশে ঠেলে দিয়ে রাস্তার ওপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা চালু করে দেয়। অ্যাম্বুলেন্স এসে আহত কজনকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বেশি-জখম সেলুন গাড়িটার সামনের দিকটা শিকলে বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে পিছনের দু চাকায় গড়িয়ে টেনে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তার পরেই দেখা যায় পথে যেমন চলেছিল তেমনি চলছে গাড়ি ও মানুষের দুমুখী দুটি ধারা।

বিমল কিন্তু আর বাসে ওঠে না। তাকে ভাবনায় পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফেরে সেদিন।

বিমল যখন চন্দ্রনাথের ঘরে এসে পৌঁছল তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকে দেখে, চন্দ্রনাথ ঘুমে অচেতন, শান্তিলতা শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বিমল গিয়ে চৌকির ধারে দাঁড়ায়।

—হঠাৎ আবার কী হল?

—মদ খেয়েছেন।

—কেন?

—কোন্ এক সর্বনেশে বাউণ্ডুলেকে জুটিয়েছেন। চাকরি করে দেবে বলেছে।

—লোকটা কে?

—চিনি না। বলেন, দেশের লোক। ছেলেবেলার বন্ধুর ছেলে। কারবার আছে। সেইখানে বাবাকে চাকরি দেবে বলেছে।

—কাল রাতে যে এসেছিল?

শান্তিলতা জবাব দেয় না।

কিছুক্ষণ পরে বিমল বলে :

—তুমি তাহলে বোসো। ডাক্তার নিয়ে আসি।

শান্তিলতা বাধা দেয় :

—এখন থাক। ঘুমোচ্ছেন। কাল সকালে দরকার হয় তো যাবেন।

—বেশ, আমি কাল ভোরেই আসব।

বিমল ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে শান্তিলতা পিছন থেকে বলে:

—একটা কথা আপনাকে বলবার ছিল আমার।

বিমল ঘুরে দাঁড়ায়।

—আপনি আমাকে কাজ করার কথা বলেছিলেন একবার।

—বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো রাজী নও।

—বাবা রাজী নয়।

—সে একই কথা।

—বাবার কথা আর মানা চলবে না। আমাকে কাজ করতে হবে।

—সত্যিই কাজ করবে?

—দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন বিমলবাবু। নইলে বাবাও মরবে, আমিও বাঁচব না।

—কাজ একটা আছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে। ইস্কুলের চাকরি। তোমার যা জানা আছে তাতেই হবে। মাইনে পঁচিশ টাকা। করবে?

—আমি পারব?

—পারবে না কেন? বাঙলা পড়তে শেখাবে, অঙ্ক শেখাবে, গল্প করে দেশের কথা বলবে—এ তুমি পারবে না?

—আপনি তাহলে কালই ব্যবস্থা করে দিন। দোহাই আপনার।

—তাহলে কিন্তু এ জায়গা ছাড়তে হবে। ইস্কুলের কাছাকাছি থাকতে হবে। ভালো করে ভেবে দেখো। কাল বোলো আমাকে।

সকাল হতে না হতেই সুখেন্দু এসে হাজির।

শান্তিলতা তখন কলতলায়। সুখেন্দু সটান গিয়ে ঘরে উঠে চৌকির উপর বসে। হাতে একটা দুধের বোতল।

—কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে জবাব দেন চন্দ্রনাথ:

—দেহটা বড্ড অবশ লাগছে, বাবা!

—দুধ এনেছি। জ্বাল দিয়ে গরম গরম খেয়ে নিন। ভয় নেই কিছু।

মুখহাত ধুয়ে ঘরে ঢোকে শান্তিলতা।

সুখেন্দুকে দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। বলে :

—আপনি এসেছেন কেন ?

সুখেন্দু কথা গায়ে মাখে না। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে :

—দুধ নিয়ে এসেছি। গরম করে খাইয়ে দিতে হবে। ডাক্তার বলেছে।

সুখেন্দুর সামনে গিয়ে সাপিনীর মতো ফুঁসে ওঠে শান্তিলতা :

—আপনার দুধ নিয়ে আপনি এখনই চলে যান এ ঘর থেকে। আপনার দুধ বিষ। ও দুধ আমার বাবা খাবে না।

সুখেন্দু আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে :

—আমার কী দোষ ? আমি কি মুখে তুলে দিয়েছিলাম ? আমি তো বাধাই দিতে গিয়েছিলাম।

—আপনার কোনো কথা আমি শুনব না। আপনি চলে যান আমাদের ঘর থেকে।

চন্দ্রনাথ উঠে বসে :

—সুখেন্দু, ও বড় রাগী মেয়ে বাবা। তুমি বরং এখন এসো। আমি একটু গায়ে জোর পেলেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।

সুখেন্দু আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে যায়।

পিছন থেকে চিৎকার করে শান্তিলতা :

—আপনার দুধ নিয়ে যান।

সুখেন্দু ততক্ষণে উঠোনে নেমে পড়েছে।

চন্দ্রনাথ বলে :

—তুই বড় অসভ্য হয়েছিস শান্তি।

শান্তিলতা দুধের বোতলটা টান মেরে উঠোনে ছুঁড়ে দেয়। পাঁচিলের ওপর ঠং করে একটা শব্দ ওঠে।

পরমুহূর্তেই বোতলটা ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। দুধটা চারিদিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে দেখে শান্তিলতা। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় ঘরের।

সুখেন্দু পিছন ফিরে তাকায়। তার মনে হয় শান্তিলতার রুখে [illegible]ানোর ভঙ্গীটা যেন অননুকরণীয়।

এ মেয়েকে হিসেবে পায় না সুখেন্দু।

বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মাকে দেখেছে। গোবেচারা মানুষ। উদয়াস্ত ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। সাত চড়েও মুখে রা কাড়ে না।

মেয়ে বলতে সুখেন্দু এতকাল সোজা হিসেবে তার মাকেই বুঝে এসেছে। নীরব, নম্র, বাধ্য।

সেই জানা হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে।

অন্য হিসেব দিয়ে শান্তিলতাকে যাচাই করতে হবে।

নতুন হিসেব বার করতে হবে সুখেন্দুকে।

নতুন হিসেব বার করতে হবে চন্দ্রনাথকেও। স্বার্থপর শহরে স্বার্থপর অস্তিত্বের মন্ত্র। মাৎস্যন্যায়ের মন্ত্র।

সুখেন্দু বলেছে—কাউকে বিশ্বাস করবেন না জ্যাঠামশাই। আমাকেও না।

ঠিক কথা। তা-ই ঠিক।

কিন্তু শান্তিলতাকে এখন সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠতে দেখে মনে হল, না, ঠিক নয়। ঠিকটা কী শান্তিলতা জানে কি ?

হিসেবে বার বার গরমিল হয়ে যায় চন্দ্রনাথের।

সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছে বিমল। শান্তিলতা যেদিন খুশি গিয়ে চাকরি শুরু করে দিতে পারে।

থাকার ব্যবস্থাও হয়েছে। মনোলতার দেওর পাটনায় বদলী হয়েছে। তার ঘরটা খালি পড়ে আছে। আপাতত সেই ঘরে গিয়ে উঠবে শান্তিলতারা। তারপর ঘর একখানা খুঁজে নিলেই হবে।

শান্তিলতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে :

—কী উপকার যে আমাদের করলেন! চিরকাল মনে থাকবে। তাহলে কালই আমাদের পৌঁছে দিন না। দেরি করে লাভ কী ?

—তা কী করে হয় ? আমার অফিস আছে না ?

—তাহলে ?

—রবিবার। শনিবার সব বাঁধাছাঁদা গোছগাছ শেষ করে রাখবে। রবিবার সকালের দিকেই পৌঁছে দেব।

মনোলতারা একটা তেতলা বাড়িতে থাকে।

বাড়িটা জীবন মাইতির।

জীবন সপরিবারে থাকে একতলায়। দোতলা তিনতলা ভাড়া খাটায়।

তিনতলায় থাকে নিখিলেরা।

বাড়িটা তৈরি হবার কয়েক মাস পরেই তারা ভাড়াটে হয়ে এসেছিল। দশ-এগারো বছর একটানা ভাড়া গুনে আসছে। নিখিলের বাবা অনাদি তিন তারিখে বেতন পায়। চার তারিখে সকালবেলাই ভাড়ার টাকাটা জীবনকে দিয়ে আসে। জীবন মাঝে মাঝে ভাড়াটা একটু বাড়িয়ে দেবার কথা বলে। বলে :

—অন্তত দশটা টাকা না বাড়ালে তো চলে না মশায়। আগের ভাড়াই চিরকাল চালিয়ে যাবেন?

অনাদি নরম হয় না। তার প্রস্তাবকে আমল দেয় না। বলে :

—ভাড়ার টাকা যা গুনেছি আজ পর্যন্ত, জমালে নিজে একটা বাড়ি করতে পারতাম। ভাড়া বরং এবার কিছু কমিয়ে দেওয়া উচিত আপনার।

—ছেড়ে চলে যান। অন্য ভাড়াটে রাখব।

—এতকাল ভাড়া গুনলাম—ছেড়ে চলে গিয়ে অসুবিধায় পড়ব? এতই বোকা ভেবেছেন আমাকে? পারেন তো উঠিয়ে দিন। আমি ঝঞ্ঝাট করব না। পারবেন কি? নিজেই মুশকিলে পড়ে

যাবেন। কোর্ট থেকে হয়তো ভাড়া কমিয়ে দেবে দশ-পনেরো টাকা।

জীবন একটা বিড়ি ধরায়।

হাই তুলে বলে :

—কী বোকামিই যে করেছি আপনাদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে!

অনাদি হাসে।

—বোকামি করেছেন? দুটো তলা ভাড়া দিয়ে বাড়ি তৈরির খরচ তো তুলে ফেলেছেন। এবার লাভ করছেন। লাভ যখন হচ্ছে সেটাই মেনে নিন। দোতলার হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে ভাড়া কমাবার মামলা করলে মুশকিলে পড়ে যাবেন। জজসাহেবেরা আজকাল ভাড়াটেদের দিকে টেনে রায় দেন—জানেন তো?

দোতলার ভাড়াটে মনোলতা।

মেয়েদের একটা হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস।

স্কুলের শুরু থেকে চাকরি।

তার চেষ্টাতেই অনেক উন্নতি হয়েছে স্কুলের।

ক্লাসে ক্লাসে তিন-চারটে সেকশন করেও মেয়ে ভর্তি করে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

মনোলতার মত এই যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আজকাল বেশি লেখাপড়া শিখছে।

পড়াশোনায় ছেলেদের মন নেই।

অদ্ভুত একটা অস্থিরতা এসেছে ছেলেদের মধ্যে।

মনোলতা বলে যে দোষ তাদের নয়।

মন বিগড়ে গেলে উপায় কী।

কোনো দিকে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না, কী করবে বুঝতে পারছে না, অকাজ ছাড়া কাজ জুটছে না--ছেলেদের দোষ কী।

ছেলেদের এই অসুবিধার সুযোগ নিয়ে মেয়েরা যে চাকরিবাকরি আদায় করবার সুযোগ-সুবিধা লুটছে, মনোলতা এটা মোটেই পছন্দ করে না।

সে স্পষ্টই বলে, এসব হল সস্তা হিসেবের ইয়ার্কি। ছেলেরা কাজ পাবে না—মেয়েদের জন্য কাজের ছয়লাপ চলবে। এ নিয়মের মানে হয়! ছেলেদের বাদ দিয়ে চলতে পারবে মেয়েরা? কী উদ্ভট বুদ্ধি!

—বুদ্ধিটা কার?

—একজনের তো নয়। কর্তাদের বুদ্ধি।

—কর্তাদের বাতিল করতে এবার তবে লড়াই শুরু করতে হয়।

—বোমা-পটকার লড়াই চলবে না কিন্তু। আমি নিজে ঠেকাবার চেষ্টা করব।

বিমল বলে :

—বোমা-টোমার ব্যাপার আমরাই কি চলতে দেব? ও সব বাতিল হয়ে গেছে। আপনি যদি বোমা-টোমাই বাতিল করতে চান, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলুন। আপনার আবোল-তাবোল উলটো-পালটা কথা শুনে আমাদের মাথা গুলিয়ে যায়।

—আমি আবোল-তাবোল কথা বলি?

—হ্যাঁ। মেয়েরা বিশ্রী রকম আবোল-তাবোল কথা বলে।

—ছেলেরা?

—ছেলেরা যা বলে তাই করে।

—এত বেশি টানছ ছেলেদের দিকে ?

—ছেলেরাই ভালো—মেয়েদের চেয়ে শতগুণ ভালো।

—ছেলেদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। দিন দিন যেন সস্তা বনে যাচ্ছে।

শান্তিলতা এতক্ষণে মুখ খোলে। বলে :

—এটা আপনার হিংসার কথা, দিদি।

—হিংসার কথা মানে ?

—হিংসার কথা ছাড়া কী ? মেয়েরা ভালো, ছেলেরা খারাপ —এ কথার কোনো মানে হয় ? ছেলেরা খারাপ হলে মেয়েরা কখনো ভালো হতে পারে ?

—কেন হতে পারবে না ?

—ছেলেমেয়ে মিলেমিশে চলে। ছেলেদের বাদ দিয়ে মেয়েদের চলে না, মেয়েদের বাদ দিয়ে ছেলেদের চলে না। তুমি একেবারে উলটো কথা বলছ, দিদি। দোষ যদি ধরতে হয় দু পক্ষের ধরতে হবে। আবোল তাবোল দোষ ধরা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

— আমরা মানে ?

—আমরা মানে মেয়েরা। ছেলেদের ঘাড় ভেঙেছি অনেক। আর ভাঙব না।

শুনে মনোলতা হাসে।

—তোর এমন বৈরাগ্য জন্মে গেছে ?

—বৈরাগ্য তো নয় দিদি—নীতিজ্ঞান।

—নীতিজ্ঞান বেশি টনটনে হলেই বৈরাগ্য জন্মায়।

—সে তো ভালো কথা।

মনোলতা মাথা নাড়ে। জোর দিয়ে বলে :

—মোটেই ভালো কথা নয়। বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে থাকার কোনোই মানে হয় না। ছুটোর মধ্যে খাপ খায় না। হয় এদিক নয় ওদিক করতে হয়।

—করলেই হল—ফুরিয়ে গেল।

—অতই যদি সহজ হত, শান্তি, তাহলে আর ভাবনা কী ছিল। সংসারে মানুষ এত অশান্তিতে ভুগত না। বুঝেশুনে চলতে পারা যায় না বলেই তো এত গণ্ডগোল বাধে। তোর কথা আমি বুঝি না, আমার কথা তুই বুঝিস না। সব যেন এলোমেলো উলটোপালটা হয়েই চলবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না। কী বিশ্রী ব্যাপার বল্ দিকি।

—বিশ্রী ব্যাপার মনে করলেই বিশ্রী ব্যাপার—নইলে নয়। সংঘাত নিয়েই তো জীবন। সংঘাত ছাড়া জীবন হয় না। আমরা মাথা গুলিয়ে ফেলি বলেই তো মুশকিল হয়।

—শুধু সংঘাত ? হাসি আনন্দ সব বাদ যাবে ?

—সংঘাত ছাড়া হাসি হয়? আনন্দ হয়? সংঘাত শব্দটার মানেই তোমরা জান না।

—তোরা সব শব্দের নতুন নতুন মানে শিখেছিস, আমরা সেকেলে বুদ্ধি নিয়ে কী করে পাল্লা দেব বল্ ?

—সেকেলে বুদ্ধি একেলে বুদ্ধির কথা নয়, দিদি। আসল কথা হল, আসল কথার আসল মানেটা ঠিকমতো বুঝতে পারা। এই যে তুমি সেকাল আর একালের কথা বললে—কোন্ ধারণা থেকে বললে ? তোমার মতে—একালে বুঝি সেকালটা বাতিল

হয়ে যায়। সেকাল বুঝি ফুরিয়ে গেছে—সেকালের আর দরকার নেই। কথা তা নয়। সেকাল ছাড়া একাল হয় না, সেকাল-একালকে পৃথক করা যায় না। কাল নিয়মে চলে, নিয়মে বাঁধা গতির মধ্যেই কালের পরিবর্তন ঘটে, আগে একরকম হয়েছিল বলেই পরে আর একরকম সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে এতটুকু ফাঁকিবাজির স্থান নেই। নিয়ম চলছে নিয়মে। তোমার বয়স কিছু বেশী হয়েছে, আমার বয়স কম। তোমার জীবনের জের টেনেই কিন্তু আমায় চলতে হবে—আকাশে ফানুস হয়ে উড়ে গেলে আমার চলবে না।

—কারই বা তা চলে? একটা গুণ কিন্তু তোর এই এক বছরে হয়েছে দেখা যাচ্ছে—কথা কইতে শিখেছিস।

—মুখ্যু মানুষ, দিদি—যেটুকু শিখেছি তোমাদের কাছ থেকে শুনে শুনেই শিখেছি।

—নে, খুব হয়েছে। এখন আমার আসল কথাটার জবাব দে তো!

—কী তোমার আসল কথা?

—সুখেন্দুকে ভোগাচ্ছিস কেন? তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলছিস না কেন?

—আমার কথা তো আমি বলেই দিয়েছি।

—কী বলেছিস?

—আমার শর্ত মানতে হবে আগে।

—কী তোর শর্ত?

—কারবার তুলে দিতে হবে।

—কেন ?

—ও লোকঠকানো কারবার। ওতে বুদ্ধি পচে যায়।

—তুলে দিয়ে খাবে কী ?

—কারিগর মানুষ, কারিগর ছিল, আবার কারিগর হতে হবে

—আর ?

—মদ ছাড়বে বলে সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—তোর কথা যদি ও মেনে নেয় ?

—তার কথাও আমি মেনে নেব।

—মাস্টারি ছাড়বি ?

—আপসে ছাড়ব।

—সুখেন্দুকে তাই বলব ?

—শুনতে চাইলে বলতে পার। যেচে নয়।

দিনের আলো ফুরোবার আগেই ঘন মেঘে আকাশ থমথমে কালো হয়ে এল। মাঝে মাঝে বাজ ডেকে ওঠে, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। অল্প যে কজন নিমন্ত্রিত হয়েছিল, জোর বৃষ্টি নামবার ভয়ে কেউই আর বেশি রাত করতে সাহস পায় নি।

হু হু করে একটা দমকা বাতাস এসে নিবু-নিবু বাতিটাকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন্দুর টিনের চালের উপর বেজে উঠল শ্রাবণধারার উন্মত্ত তাণ্ডব।

শান্তিলতা উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

সুখেন্দুও তার পিছন পিছন উঠে আসে। বলে :

—আমার মায়েরও এমন বর্ষার রাতে ফুলশয্যে হয়েছিল।

—তুমি কি করে জানলে?

—তুই কিন্তু আমার মায়ের মতো নোস। আমার মা বড়ো শান্ত ছিল।

—আমি?

—তোর বড়ো তেজ। মেয়েমানুষের, বউমানুষের অত তেজ থাকা ভালো নয়।

—আমিও শান্ত। আমার নাম শান্তি।

আকাশে সাদা মেঘের ছড়াছড়ি। কোথা থেকে উড়ে এসে একসাথে জোট বেঁধে একদিকে ভেসে চলেছে।

একরত্তি উঠোনটুকুতে দাঁড়িয়েই বা আকাশের কতটুকু নজ়র পড়ে। দাওয়ার খুঁটিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে তারও বেশীর ভাগ চোখের আড়ালে পড়ে যায়। ঘাড় বাঁকিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ওপাশে রাসমণিদের চালাটার উপর দিয়ে একটা ফালি শুধু দেখা যায় আকাশের।

ঘাড়টাই শুধু ব্যথা হয়।

আথালিপাথালি মেরেছে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুঁটির সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে। ব্যথায় টনটন করছে সমস্ত শরীরটাই। ঘাড় বাঁকিয়ে সাদা মেঘে ছয়লাপ ওই ফালিটুকুর চেয়ে আরও

খানিকটা দেখবার চেষ্টা করলে ঘাড়টা যেন মটকে যাবে মনে হয়। তবে, সারা আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের একমুখী সমান গতিতে ভেসে চলা দেখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না শান্তিলতার।

ছেলেবেলা থেকে কত দেখেছে। আকাশ জুড়ে সাদা মেঘের ভেসে চলবার লীলা, আর আজ-ভাঙা কাল-আস্ত চাঁদটার সাথে লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে ঘুমচোখ জড়িয়ে এনে-এনেই সে যেন বড় হয়েছে—সংসারে উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি আর একটানা বকুনির তিতো স্বাদ ভুলে গিয়ে।

দাওয়ার কোণের দিকে খানিকটা ঘিরে চাঁদির রান্নাঘর। চালটা টিনের, দাওয়াও একটু চওড়া আছে। সামনাসামনি এই দুটি ঘরেরই নামমাত্র একটু দাওয়া আছে, অন্য ঘরগুলির বেড়া উঠেছে ভিটের শেষ ইঞ্চি স্থান দখল করে। ছোট লণ্ঠনটা জ্বেলে চাঁদি তার ঘুপচি রান্নাঘরের ডিবরিটা নিভিয়ে দেয়। খেলবার মতো ছোট লণ্ঠনটায় সামান্য বেশি তেল পোড়ে। বাইরে হাওয়ায় যে নিভে যায় না সে সুবিধাটুকুর দাম তো দিতে হবে।

ভাঙা কাঁসরের মতো খ্যানখ্যান করে ওঠে চাঁদির গলা :

—এসে বসে যার যারটা খেয়ে লিয়ে যাও। অত ঘুম চলবে নি, পিটিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

স্বামী, দেওর, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, আর পঙ্গু হাবাটে ননদটার খ্যাঁট যা করার দিনে দিনেই চাঁদি সেরে রাখে। কিন্তু আজ ঘরে কিছুই ছিল না। আটটায় ছুটি পেয়ে নন্দ চাল আটা আলু পেঁয়াজ আর দু-তিন রকম মাছের খানিকটা লেজ-কাঁটা নিয়ে ঘরে ফেরার পর চাঁদি রান্না শুরু করেছে।

নন্দকে দোকানে গিয়ে শিশিতে একটু তেল আর কিছু মশলাপাতিও এনে দিতে হয়েছে।

—দাদা গেছে কোথা ?

- ·কে জানে কোন চুলোয় গেছে তোমার দাদা।

এবেলার খ্যাঁটের জোগাড় করে দিয়ে নন্দও তার দাদার মতো কোন চুলোয় গেছে কে জানে—এখনও দুজনার পাত্তা নেই।

ঘুমে কাতর বাচ্চাগুলি খিদেয় বোধ হয় বেশী কাতর ছিল। কাউকে ডেকে, কাউকে টেনে হিঁচড়ে তুলে এনে খেতে বসাতে বেশী হাঙ্গামা করতে হয় না।

মস্ত একটা হাই তুলে শুকনো কাশির একটা ধমক সামলে এতক্ষণে যেন শান্তিলতাকে দেখতে পেয়ে চাঁদি খ্যানখ্যান করে বেজে ওঠে :

—কেমন মজা টের পাচ্ছিস লো শান্তি। ডিঙি মেরে মেরে মিছিলের পিছু পিছু ছুটবি আর ?

—মিছিলের আওয়াজ পেলে তুমিও তো ছুটে যাও।

—যাই তো। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখে ঘরে ফিরি। তোর মতো আখায় ভাত চাপিয়ে ঘরদোর ফেলে রেখে মিছিলে ভিড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াই সারাদিন ? ধিঙ্গিপনার সীমা আছে তো মেয়েমানুষের, বউমানুষের।

নিরুপায় ছোট মেয়ের নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মতো নালিশের সুরে বলে শান্তিলতা :

—ওরা যে সবাই হাসিমুখে অমন করে ডাকল দিদি। তেতলা

বাড়ির মোটা বউটা ছিল, ওই যে সুন্দর গান করে সেই মেয়েটা ছিল—আরও কত মেয়ে-বউ-গিন্নীবান্নীরাও ছিল।

এটা চেয়ে ওটা চেয়ে ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি জুড়েছিল। দক্ষিণের চালাটার বেড়াটার গায়ে কাঠের গরাদ বসানো ফোকর-টাতে মুখ রেখে রাসমণি চেঁচিয়ে বলে :

—তোদের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো খাটাসের মতো চিল্লায়, চাঁদি। দিনভোর জ্বরে ছটফটিয়ে মানুষটা একটু ঘুমিয়েছে, ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে।

পরমাশ্চর্য ব্যাপারই বটে যে, বদমেজাজী জাতকুঁদুলী চাঁদি তার শানানো তৈরী গলা যথাসাধ্য নরম করে জবাব দেয় :

—ছেলেপিলেরা একটু চিল্লায়। তা করা যায় কী বলো।

ওদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে দক্ষিণের চালাটার পশ্চিমাংশের অধিবাসী দিবাকরের। সবাই জানে, কদিনের মধ্যে এমন ঘুম দেবে দিবাকর যে চারপাশে হাজার বোমা ফাটলেও সে ঘুম আর ভাঙবে না।

রাসমণিও তা জানে। যুদ্ধফেরত জবরদস্ত সৈনিকটা রক্তবমি করে মরছে। টি. বি. নয়, পেটের মধ্যে কী পেন হয়েছে। উদ্ভট একটা ব্যাপার। যুদ্ধে গিয়ে আহত হয়েছিল, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। কবে যুদ্ধ থেমে গেছে, এতদিন পরে বোমার টুকরোর আঘাতটা ঘনিয়ে উঠে ফাটিয়ে দিতে চাইছে তার দেহটা। কাল দিবাকর হাসপাতালে যাবে। দুদিন ধরে চেষ্টা করে ব্যবস্থা করা গেছে।

আধো অন্ধকার গলি দিয়ে এঘর-ওঘরের মানুষেরা যাতায়াত করে, বাইরের লোকও আসে যায়। কোনো ঘরে ল্যাম্প, লণ্ঠন বা প্রদীপ জ্বলে, আবার নিভে যায়। এ দিকটাকে 'ভদ্র' এলাকা আখ্যা দেওয়া যায়। গলিটা পাক খেয়ে আরও সরু আরও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পাশের দিকে এলোমেলো যে ঘরগুলির দিকে এগিয়েছে সেখানে এখন চলছে জীবন থেকে পুরো মাত্রায় মজা লুটবার হুল্লোড়—বেতালা বেসুরো গানবাজনা, ঘুঙুরের ঝমাঝম আওয়াজের সঙ্গে চেঁচামেচি, হাসিকাশির ধমক।

গায়ে ফরসা জামাকাপড়, পায়ে পালিশকরা জুতো আর এসেন্সের ভুরভুর উগ্র গন্ধ নিয়ে খাশবাবু ছু-একজন বা পাঁচ-সাত জনের ছু-এক দল টর্চের আলো জ্বেলে সরু গলিতে পাক নেয়—সঙ্গে দালাল থাকলে সে-ই টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ছু-একজন মাতাল ওই গলিতে বাঁক নেবার বদলে এই উঠোনে এসে ঢোকে—কেউ ধমক অর্থাৎ গালি খেয়েই বেরিয়ে যায়, কাউকে ছু-চারটা গাঁট্টা মেরে গলাধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে খুঁটিতে বাঁধা শান্তিলতার দিকে চেয়ে থাকে এঘর-ওঘরের বাসিন্দারা—কিছু বলে না। রাসমণিদের দাওয়ায় বসে চার-পাঁচজন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে জটলা করে। ওদের মধ্যে নন্দ, আবদুল আর সুখলাল শান্তির চেনা। নন্দর

সমবয়সী আর দুজনকে শান্তিলতা দু-একবার শুধু চেয়ে দেখেছে। শান্তি জানে, তাকে নিয়ে জটলা নয়। সবাই যে দু-এক নজর শুধু তাকিয়ে দেখে, কাছে আসে না, কথা বলে না, সেজন্য শান্তির কোনো ক্ষোভ নেই।

তার ইচ্ছাকেই ওরা সম্মান দিচ্ছে। নইলে মুখ ফুটে শুধু একবার ডাক দিলে মেয়েপুরুষের কত জোড়া হাত চোখের পলকে তার বাঁধন খুলে তাকে মুক্তি দেবে তা কি আর অজানা আছে শান্তিলতার।

কিন্তু বড় রাগী, বড় একগুঁয়ে, বড় লোভী আর স্বেচ্ছাচারী সুখেন্দু—অন্য সব দিকে মানুষটা যতই ভালো হোক। নিজের তেজ যেন তার সহ্য হয় না, অহঙ্কারে বিকারের ঘোরে মাথাটা কেমন বিগড়ে থাকে। ঘরে ফিরে তার বাঁধন খোলা দেখলে, এরা তাকে মুক্তি দিয়েছে জানলে, খেপে গিয়ে কী কাণ্ড করবে কে জানে।

একলাটি সে কী-ই বা করতে পারে এতগুলি মানুষের বিরুদ্ধে —সবাই মিলে ধরে বেঁধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই দড়ি দিয়ে এই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলতে পারে সুখেন্দুকে।

কিন্তু তারপর? এটাই শান্তির আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে। তার বাঁধন খুলে আজকের মতো সুখেন্দুকে নয় ওই খুঁটির সঙ্গেই বেঁধে রাখা গেল—কিন্তু তারপর? মরিয়া মানুষটার রোখ চাপবেই যতটুকু পারে প্রতিঘাত হেনে ধ্বংস হয়ে যাবার, মরে যাবার। সেই আত্মঘাতী উন্মত্ততা ঠেকাবে কে? তারপর নিয়েই শান্তিলতার যত মুশকিল।

এদের হস্তক্ষেপের দরকারও হয় না। তেতলা বাড়ির হাসি বউদি, মণি-দিদিদের একটা খবর দিলে সর্বাঙ্গে টনটনে ব্যথা নিয়ে এভাবে খুঁটিতে বাঁধা হয়ে তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। তেতলা বাড়ির সামনেটা ওদিকের বড় রাস্তায়। পিছনের দিকে তিন তলার কোণের ঘরটার জোরালো বাল্‌বের এক ঝলক আলো ক্ষীণ হয়ে এসে পড়েছে রাসমণিদের ঘরের চালায়।

খবর দিলে ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে চা দুধ পাঁউরুটি খাইয়ে ওই ঘরেই হয়তো শুইয়ে রাখবে—খ্যাপা মানুষটা ঘরে ফিরলে তাকে বুঝিয়ে সামলাবার জন্য আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে অপেক্ষা করবে। কিন্তু, শান্তিলতা জানে, ওভাবে সুখেন্দুকে সামলানো যাবে না। হাসি বউদি, মণিদিদিদের সঙ্গে খানিকটা তর্ক হয়তো সে জুড়বে—রাগারাগি করে, গালাগালি দিয়ে অপমান ওদের সে করবে না। কিন্তু বুঝবেও না, মানবেও না ওদের কোনো কথা। অন্য অবস্থায় যে রাগে সে বোমার মতো ফেটে পড়ত সেই রাগ চেপে রেখে ব্যঙ্গের সুরে হয়তো জানিয়ে দেবে: শান্তিকে তারা যখন আদর করে নিয়ে গেছে, শান্তি তাদের কাছেই থাক। সারা জীবনের জন্যই থাক। শান্তিকে দিয়ে তার আর কোনো কাজ নেই।

শান্তিলতাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা এসে মিটমাট-মীমাংসার জন্য সদুপদেশ ঝাড়তে আরম্ভ করে অশান্তি ঘটালে হয়তো এই ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাবে, অন্য সাথী খুঁজে নিয়ে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবে জীবনের গতি।

'কেউ একটু জল দাও না গো'—

কান পেতেই যেন ছিল সকলে। পাশের ঘরের সারদা অ্যালুমিনিয়মের বড় গেলাসে জল নিয়ে বেরিয়ে এলে অন্যেরা আর কেউ নড়ে না।

জানালার ফোকরে মুখ রেখে রাসমণি বলে :

—শুধু জল খাস নে শান্তি, একটুখানি দাঁড়া।

দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ছুটো রসালো দানাদার শান্তির মুখে গুঁজে দেয়, বলে :

—শখ চেপেছিল দানাদার খাবেন। কিনে আনতে গিয়ে মোড়ের দোকানে ডাগদরবাবুকে শুধোলাম। ডাগদরবাবু বললেন, খেতে চাইলে দাও। ছু-তিন গণ্ডা একবারে দিও না তাই বলে— ছু-একটা দিও। দানাদার কিনে ঘরে ফিরে দেখি কী, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছেন। সুই দিতে এসে ডাগদর বলে গেল, দানাদার দিয়ে আর কাজ নেই।

এক গেলাস জল শুষে নেয় শান্তিলতা। সারদা বলে :

—মানুষটা ফিরতে এত দেরি করছে কেন আজ! একজনকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে গেছে খেয়াল নেই?

শান্তিলতা বলে, তোরা শো গিয়ে ভাই।

কাছের ও দূরের রেডিওগুলি থেমে যায়। রাত্রি বাড়ে। সরু গলির ও-মাথার পাড়াতে মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়াভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও হল্লা মোটামুটি ঝিমিয়ে আসে। কাছাকাছি কোথাও একটা বাঁশের বাঁশি বেজে চলে। কোন্ দিক দিয়ে সুরটা ভেসে আসে ঠিক ঠাহর পায় না। আকাশের ফালিটুকুতেও ছাড়াছাড়া সাদা মেঘ জমাট বেঁধেছে—ধীর মন্থরগতি জগৎজোড়া পুঞ্জীভূত শুচিশুভ্রতার অপ্রতিহত অভিযানের মতো।

শ্রান্তিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোখ বুজে এসেছিল শান্তিলতার, একাধিক মানুষের পায়ের শব্দে চমক ভেঙে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে শান্তিলতা।

ছ-সাত জন নানা বেশের মানুষ সুখেন্দুকে ধরাধরি করে নিয়ে উঠোনে ঢোকে। সুখেন্দু স্খলিত পায়ে হাঁটে। ওদের মধ্যে একজনের গায়ে উর্দি, পায় বুটজুতো—দু-এক বার তাকে যেন দেখেছে মনে হয় শান্তিলতার।

আস্তিনগুটানো আদ্দির পাঞ্জাবি পরা মানুষটা সবার চেনা—এ এলাকার সে নামকরা গুণ্ডার সর্দার।

গুণ্ডা হিসাবে রাজারই সামিল—নামটাও তার বাবুরাজা।

সুখেন্দুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলে রেখে তারা বেরিয়ে আসে।

বাবুরাজা উঠোনে দাঁড়ায়। শান্তিলতার সঙ্গে একটু রসিকতার লোভ সামলাতে পারে না। হেসে বলে :

—বেঁধে রেখে গেছল বুঝি? আর দু ঘা লাগিয়ে দেব হারামজাদাকে?

শান্তিলতা বলে :

—হাঙ্গামা কোরো না। ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো।

সঙ্গী একজন বাবুরাজাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে। বাবুরাজা চোখ ফিরিয়ে চারিদিকে তাকায়। দাওয়ায় আর দরজাতেই শুধু মানুষ এসে দাঁড়ায় নি, শুধু জানালা দিয়েই মানুষেরা মুখ উঁকি দিয়ে নেই, গলি থেকে উঠোনে ঢোকবার মুখেও কতগুলি মানুষ দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেন কোনো নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য প্রতীক্ষারত নিরীহ নীরব দর্শক।

ওপাশের পুরানো একতলা দালানটার চিলেকোঠার ছাদ থেকে বড় টর্চের ফোকাসকরা জোরালো আলো বাবুরাজাদের গায়ে এসে পড়ে। শুধু চমক লাগে না, বেশ একটু সন্ত্রস্তই হয়ে ওঠে বাবুরাজারা।

কয়েক মুহূর্ত পরে আশেপাশে চিহ্নও দেখা যায় না তাদের।

শান্তি ডাকে কি না, সেজন্য অপেক্ষা না করেই যে যার ঘরে ঢুকে যায়। শান্তি যদি ডাকে ঘরের ভিতর থেকেও তার ডাক শোনা যাবে। জোরের সঙ্গে, সুস্পষ্ট ভাষায় জানানো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গায়ে পড়ে তাকে দরদ দেখাতে চাওয়ার মানে হয় না।

শান্তি রাগতেও জানে। রেগে আগুন হয়ে সে হয়তো ধমক দিয়ে বসবে :

—ছ্যাবলামি করতে কে ডেকেছে, তোমাদের ? আমার ভালো চাও, না মন্দ চাও, শুনি ?

নন্দর দাদা মনোহর ঘরে ফিরে খেতে বসেছিল। ঘরের মেঝেতে লণ্ঠনের সামনে তাকে সব বেড়ে দিয়ে চাঁদিও কাঁসিটা নিয়ে বসে গেছে। দেরি করা ধাপ্পাবাজি। মনোহর চাইলেও আর কিছুই তাকে দেওয়া চলবে না। দিলে রাতটা উপোস দিয়ে কাটাতে হবে চাঁদিকে।

নন্দ-আবদুলেরা দাওয়ায় বসে জটলা পাকাচ্ছে। বিড়ি বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে, একটা বিড়ি ধরিয়ে দু-একটা টান দিচ্ছে পালা করে।

ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণস্বরে সুখেন্দু বলে :

—উঠে দাঁড়াতে পারছি না রে। দড়িটা খুলতে পারবি নিজে নিজে ?

শান্তি নীচু গলায় বলে :

—ওদের কাউকে ডাকি ?

সুখেন্দু তাড়াতাড়ি বলে :

—না না, ওদের ডেকে কাজ নেই। আমিই বরং কোনোরকমে উঠছি দাঁড়া।

—থাক, তোমাকে উঠতে হবে না ! চেষ্টা করে আমিই খুলছি বাঁধনটা।

হাত বাঁধা, ঘাড় বাঁকিয়ে ধারালো দুপাটি দাঁত দিয়ে বাঁধনদড়ির যেখানটা নাগাল পায় সেখানটা কামড়ে কামড়ে কেটে ফেলে শান্তিলতা। সময় লাগে খানিকটা।

অধীর সুখেন্দু দু-তিন বার জিজ্ঞাসা করে :

—কী করছিস? পারছিস না?

—এই হল বলে। আর একটু।

এক জায়গায় কাটা পড়তেই প্যাঁচানো দড়ি ঢিলে হয়ে যায়, হাত আলগা করে গিঁট খুলে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

ঘরে গিয়ে আগে আলো জ্বালে শান্তিলতা।

সুখেন্দুর চোখ টকটকে লাল। যেন ভূত দেখছে এমনিভাবে চোখ বড় বড় করে মেলে শান্তিলতার মুখের দিকে চেয়ে সে বলে :

—মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তোর! মুখে মেরেছিলাম নাকি রে?

—ও কিছু না।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে কয়েকবার কুলকুচো করে শান্তিলতা কড়া ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে :

—এমন দশা হল কেন তোমার?

সুখেন্দু দুহাতে পেটটা চেপে ধরে রেখেছিল। কয়েকবার হাঁপিয়ে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে :

—বজ্জাতি করতে চাই নি বলে পিটিয়ে লাশ করে দিয়েছে। পিলে লিভার একটা কিছু ফেটে গেছে নিশ্চয়। দু-তিন বার রক্তবমি করেছি।

শান্তি আর একবার কুলকুচো করে মুখের রক্ত ধুয়ে ফেলে শান্ত সুরেই বলে :

—ওঃ, মাথা ফাটায় নি? কাপড়চোপড়ে যে রক্ত লেগেছে, সেটা বমি করেছ? যাক গে, ওদের ডাকি।

—না না, ওরা এসে টিটকারি দেবে।

—দিলে দেবে। টিটকারির ভয়ে মরবে নাকি বোকার মতো?

সবাই এসে ভিড়ও জমায় না, টিটকারিও দেয় না।

ডাক্তার আসতে আসতে সারদা আর চাঁদি কাপড় ছাড়িয়ে কার ঘর থেকে তোশক এনে মেঝেতে বিছানা পেতে শান্তিলতাকে শুইয়ে দেয়। নন্দ-আবদুলেরা সাবধানে সুখেন্দুর গা থেকে রক্ত-মাখা কাপড়জামা ছাড়িয়ে নিয়ে আলগা করে একটা চাদর জড়িয়ে দেয়।

কলসী থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে সুখেন্দুর মাথাটা ধুয়ে দিয়ে বুনোর মা হাতপাখা নিয়ে বাতাস শুরু করে।

কলসীতে জল বেশি নেই। জলের বড় টানাটানি চারিদিকে।

ডাক্তার আসতে আসতে সুখেন্দু আর একবার খানিকটা রক্ত উগরে ফেলে।

শান্তি উঠে বসে। এবার আর কেউ তাকে শুয়ে থাকতে বলে না।

ডাক্তার এসে সুখেন্দুকে পরীক্ষা করছে, রাসমণি ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। বলে:

—যাবার আগে মোর ঘরে মানুষটাকে একবার দেখে যাবেন

ডাগদরবাবু। বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল, নাড়ীটা এখন ছেড়ে গেছে মনে হয়।

কানে স্টেথোস্কোপ লাগানো থাকায় ডাক্তার যে তার মৃদুস্বরে বলা কথাগুলি শুনতে পায় নি সেটা বোধহয় এতক্ষণে রাসমণির খেয়াল হয়। সে চুপ করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্তিলতা নীরবে উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ায়।

ডাক্তার পেট-টেপাটেপি আরম্ভ করলে সুখেন্দু আর্তনাদ করে ওঠে। ডাক্তারের ধমক খেয়ে গোঙাতে গোঙাতে বলে :

—আর তোকে মারব না শান্তি, আর তোকে বাঁধব না।

সুখেন্দুর একটু দিশেহারা ভাব জেগেছে টের পাওয়া যায়। সেই একরোখা একগুঁয়েমিটা যেন আর নেই।

কী করবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

ভাব জমাবার চেষ্টা করছে সকলের সঙ্গে। গা বাঁচিয়ে সাবধানে চলাফেরা করছে।

গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে রক্তবমি করেছিল।

সকলে তাকে সহানুভূতি জানিয়েছে।

কিন্তু গুণ্ডাগুলির কোনো শাস্তি হয় নি।

শান্তিলতা রাগ করে বলে :

—যাও কেন গুণ্ডাদের ব্যাপারে?

—চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে প্রাণ যে চায় না—করব কী ?

—তুমিও যে গুণ্ডা নও সেটা কি সবার জানা আছে ? জগৎ-সংসার জেনে গেছে, আমাকে খুঁটিতে বেঁধে বেড়াতে গিয়েছিলে। তারপর কে টানবে তোমার দিকে ?

—তুই শত্রুতা না করলে সবাই টানত।

—কী শত্রুতা করেছি ?

—সবার কাছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস।

শান্তি বিষম রেগে যায়। বলে :

—তুই-তোকারি চলবে না বলেছি না হাজার বার !

সুখেন্দুও রেগে যায়।

—বলেছিস তো বেশ করেছিস—আমার মাথা কিনে ফেলেছিস। সম্মান করে কথা কইতে হবে ? ও সব ইয়ার্কি চলবে না আমার বাড়িতে।

—আমি কিন্তু কড়া ব্যবস্থা করব বলে রাখছি।

—যা খুশি কর্। ব্যবস্থা করতে আমিও জানি।

—জান বলেই তো পিটুনি খেয়ে নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়।

—ওসব হয় পুরুষমানুষের।

—কত মস্ত পুরুষমানুষ !

—দেখবি কত মস্ত ?

ঝড়ের বেগে সুখেন্দু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ছুটির দিন।

কাজে ছুটতে হবে না বলে সুখেন্দু বেলা ছুটো বাজিয়ে বাড়ি ফেরে।

নেয়ে এসে পিঁড়ি পেতে বসলে শান্তিলতা তাকে থালা ভরে ভাত বেড়ে দেয়।

—এত ভাত খেতে পারব ?

—যা পারবে খাও না। আমি তো পাতে বসেই খাব।

সুখেন্দু হাসে।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে এক খাবলা বেগুনভাজা মুখে পুরে দিয়ে বলে :

—তোমার সঙ্গে সত্যি আমি পারলাম না।

শান্তিলতাও হেসে ফেলে।

—কী করে পারবে ? এ তো তোমাদের পুরুষমানুষের সস্তা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। ঘর-সংসার করতে ঘরে এসেছি, ছেড়ে কথা কইব কেন ?

সুখেন্দু হাসে।

—তোমার কথা বড় মিষ্টি লাগছে।

শান্তিও হাসে।

—বেশি মিষ্টি লাগলে পেট খারাপ হয়।

—জ্বালিও না কিন্তু—দোহাই তোমার।

—কাল কারখানায় একটা কাণ্ডই হয়ে গেছে শান্তি।

—কী?

খেতে খেতে রসান দিয়ে ব্যাখ্যান করে সুখেন্দু।

—আমাদের বড় সায়েবের হয়েছে ডিসপেপসিয়া। লাঞ্চের সময় ফুড আর চা-টাই খেল—বিস্কুট কেক সিদ্ধ আণ্ডা দুটো ছুঁলও না।

খাশ পিয়ন পিনাকী—যেন সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা একটা নারকেল-কাঠির সরু সেপাই। মোটা হবার আশায় সে আড়ালে বসে অণ্ডাগুলি সাবাড় করছে, কোথা থেকে এক ষণ্ড এসে বড় সায়েবের খাশ কামরার জানলার নীচের ফুলগাছটা মুড়িয়ে, খেয়ে চলে গেল।

ফুলগাছগুলি আছে আছে, বড় সায়েব কোনো দিন চেয়েও দেখে না।

আজ ফুড খেয়ে একটু ঝিমিয়ে উঠে জানলার বাইরে নজর পড়তেই চমকে উঠল—ফুলের গাছগুলি মুড়ানো।

লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বেধে গেল কারখানায়।

প্রথমেই তলব হল ছোট সায়েব কুমারবাবুর।

—কে মুড়িয়ে দিয়েছে আমার সাধের ফুলগাছ?

—ফুলগাছ কে মুড়িয়ে দিয়েছে জানি না সার। আমার ডিউটি মেশিনারি কেউ না ড্যামেজ করে দেখা, ওয়ার্ক স্লো না হয় দেখা, প্রোডাকশন আরও অন্তত হাফ পার্সেন্ট বাড়াবার জন্য ফ্যাক্টরি আইন মান্য করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—

ধাঁই করে অমনি এক চড় ছোট সায়েবের গালে।

ছোট সায়েব সঙ্গে সঙ্গে টের পায় বড় সায়েয শুধু ফুড খায় নি, দু-তিনটে অণ্ডাফণ্ডার চেয়ে শতগুণ বেশি দামী পেগও খেয়েছে।

—সার সার। ফুলগাছগুলির দিকে আমার নজর রাখা উচিত ছিল সার। এখন কী করব সার?

নিখুঁত নির্ভুল সেকেণ্ড-মেনে-চলা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বড় সায়েব বলে:

—নোটিস জারী করো যে ফ্যাক্টরিতে সিরিয়স একটা চুরি হয়েছে। আমার রিটন্ হুকুম ছাড়া কারখানার কাজ বন্ধ হবে না। ছুটির টাইমের পরেও একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

—ওরা তো করবে না সার।

—করবে না মানে?

—টাইমের বেশি এক মিনিট বেশি খাটাতে চাইলেও খেপে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট পিছিয়ে দিয়েছিলাম ঘড়িটা, ওরা কাজ থামিয়ে হৈ চৈ করে উঠল—ঘড়ি খারাপ।

নিজের মাথায় দু-তিনটে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া হুকুম ঝেড়ে দিল:

—কাম আফটার আধঘণ্টা। ফর আধ ঘণ্টা আই উইল ট্রাই টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ব্যাপারটা।

—খাও, খেতে খেতে বলো।

ডালমাখা এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে দিয়ে বলে চলে সুখেন্দু—

ছোট সায়েব অভিমানে ঠোঁট উলটে চলে যাচ্ছে, বড় সায়েব ডেকে বলে:

—অফেন্স নিও না নিয়োগী। ভুলে যেও না তুমি আমি দুজনেই বোথ আর ফেসিং এ সিরিয়স ক্রাইসিস।

—আমি তো নিয়োগী নই সার। নিয়োগী সায়েবকে লাস্ট এপ্রিলে কিক আউট করে দিলেন, নিয়োগী সায়েবের কাজগুলি আমাকে দিলেন—

—আই নো, আই নো। ডোণ্ট ট্রাই টু টীচ মি—

—আমি নিয়োগী নই সার। আমি কুমার রায়।

—রাগ কোরো না। ব্যাপারটা বুঝতে ট্রাই করো সিরিয়সলি। বিপদটা ভালো করে রিয়ালাইজ না করলে তুমি আমি দুজনেই ফিনিশ হয়ে যাব—আদারওয়াইজ তুমি আমি তোমরা আমরা—এভরিবডি উইল বি ড্যাম্‌ড্‌।

—আমি তো সার নিয়োগী নই—ওঁর বদলে আমাকে সেদিন অ্যাপয়েণ্ট করলেন—

বড় সায়েব আবার একটা চড় বসিয়ে দেয় ছোট সায়েবের গালে। লাথি মারে না বলেই ছোট সায়েব সেটা সয়ে যায়।

গুরুজন কান মলবে, গালে চড় মারবে—ও অধিকার তাদের দিতেই হবে।

গল্প শেষ করেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, যায় সুখেন্দু। পাতের বাকী ভাতগুলো গপগপ করে খেয়ে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে শার্টের আস্তিনেই মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায় সুখেন্দু। যেতে যেতেই বলে যায়—

—মীটিং আছে। ফিরতে রাত হবে শান্তি।

শুধু ঘর-বার, ঘর-বার। ঘুম আসে না শান্তিলতার।

এই মাঘী বাদলার রাত। মানুষটা এত রাত্তিরেও ঘরে ফিরল না। দেরি বলে এত দেরি!

শান্তিলতা ঘুমোতে পারে না। দরজা খুলে এক-এক বার দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। হিম বাদলা হাওয়া আছাড় খেয়ে পড়ে তার চোখে মুখে। কান পেতে রাখে পরিচিত পায়ের শব্দটির জন্যে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে চায় গলির মুখটায়—উৎকণ্ঠ প্রত্যাশার তীব্র আলোয় যেন ভেদ করতে চায় সেই ঠাণ্ডা জমাট অন্ধকারকে।

ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজে রায়সাহেবের দেউড়িতে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয় শান্তিলতা। ছোট্ট হারিকেনটার আলো দপদপ করে জ্বলে দমকা বাতাসে জানলার ধারে। গরাদে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয় ঈস্ট এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওআর্কসের টার্নার সুখেন্দু দাসের বউ। মাঝে মাঝে ঝিম কেটে যায়। চোখ মুছে আবার চেয়ে থাকে সেই ভেজা কনকনে ঠাণ্ডা অন্ধকারের দিকে।

ঘুমোতে পারে না শান্তিলতা।

ঘুমোতে পারে না সুখেন্দু দাস। ঈস্ট এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওআর্কসের টার্নার।

মীটিং ভাঙে রাত এগারোটায়।

লেদম্যান প্রফুল্ল বলেছিল:

—এই দুর্যোগের রাতে কোথায় যাবে দাস? রাতটা আমার কাছেই থেকে যাও।

রাজী হয় নি সুখেন্দু।

—না ভাই। ফিরব বলে বেরিয়েছি। একা মানুষ বাড়িতে। ভাবনায় ঘুমোতে পারবে না সারারাত।

—তবে যাও। দেখো, নৌকো পাও কিনা।

সুখেন্দু ফিরতে চায়। একা একা হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে চায়।

নতুন ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মাথায় ইয়াকুব আলি। পোড়খাওয়া মানুষ। মজদুরের ছেলে। বিশ বছর ধরে লড়ছে। মজদুরের নেতা। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেই মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে তার।

সুখেন্দু ভাবতে চায়। বুঝতে চায়। ইয়াকুব সাহেব মানুষটা খাঁটি। দিলটা সাচ্চা। বাজে কথা বলে নি। নিজের সুখের কথা বলে নি। সব মানুষের সুখের কথা বলেছে। সব অ-সুখের মূলটা কোথায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে:

—দেখো ভাই, আসল ব্যায়রাম একটাই। সেইটাকে খুঁজে

দেখো। এখানে ওখানে মেরামতি করে কী হবে? মূল ধরে টান দিতে হবে। রোগের জড়টাকে মারতে হবে।

কনকনে শীতে খেয়াঘাটে গিয়ে দাঁড়ায় সুখেন্দু। একা। উত্তুরে হাওয়া বইছে। টের পাচ্ছে হাড়ে মজ্জায়। শীতের তীক্ষ্ণতা ছাড়া আর সমস্ত আবেগ অনুভূতি চিন্তাভাবনা যেন অসাড় করে দিতে চায়।

ওপারে শ্মশানঘাটের জ্বলন্ত চিতাটা নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। ছোট ছোট কয়েকটা শিখা তখনও মাথা তুলছে।

সবকিছু কেমন যেন অজানা অচেনা মনে হয় সুখেন্দুর। আগুন কেমন তাও যেন ভুলে গেছে। চেষ্টা করলেও মনে পড়ে না। এই কনকনে ঠাণ্ডার বদলে যদি আমকাঠের প্রকাণ্ড চিতার লেলিহান শিখা তার জীবন্ত দেহটা ঘিরে থাকত! কিংবা এখন যদি থাকত নিজের ঘরের নিরেট আশ্রয়ে! মাঘী বাদলার মাঝরাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার শুধু ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢোকার অধিকার। নীচে তোশক, ওপরে লেপ। গা-পুড়ে-যাওয়া জ্বরের তাপের উপে যাওয়ার পথ নেই। কেমন লাগত তা হলে?

আজ মাঝরাতে নদীর ধারে খেয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারা যায় না কেমন লাগত ম্যালেরিয়া জ্বর এলে নিরাপদ আশ্রয়ে লেপ তোশক চাপা দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপা।

কিন্তু না—এলোমেলো চিন্তা সইবে না।

হাঁকে ডাকে শম্ভুকে জাগিয়ে খেয়া নৌকো আনাতে হবে ওপার থেকে এপারে। নদী পার হতে হবে তার খেয়ায়। ঘরে পৌঁছতে হবে। আশ্রয় নিতে হবে লেপ-তোশকের বিছানায়।

আপনজনকে সুযোগ দিতে হবে গরম মাথা ঠাণ্ডা করে দেবার। নইলে এই নির্জন নদীর ধারে এই হি হি হাওয়ায় নিশ্চিত মৃত্যু।

খেয়াঘাটের চালার বাইরে অশথ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায় সুখেন্দু। ওপার পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করে শম্ভুর নৌকোয় আলো জ্বলে কি না।

আর তখনই চোখে পড়ে দিগন্তকাঁপানো আওয়াজ তুলে এপারে এগিয়ে আসা ইন্দ্রের পুষ্পক রথটাকে।

হঠাৎ যেন চিলের ছোঁ মারার কায়দায় মাটির দিকে মুখ বাঁকিয়ে সোজা এসে আছাড় খেয়ে পড়ল শম্ভুর চালাটায়। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। চোখের সামনে আকাশভাঙা দুর্ঘটনায় ভেঙে চুরমার হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল শম্ভুর বড় চালাঘরটা।

আগে বড় চালার দাওয়ায় রান্না করত গঙ্গা। সারা শীতকালটা দাওয়ার উনুনের ধোঁয়া আর ডাল সম্বরের ঝাঁঝ ঘুম ভাঙিয়ে কাতর করত বাচ্চা দুটোকে। যুদ্ধের বাজারে দুটো পয়সা বাড়তি হাতে আসতে বাঁশবনের গা ঘেঁষে দুটো আস্ত করোগেট টিনের চালা খাটানো বাঁশমাটির রান্নাঘর বানিয়ে দিয়েছে শম্ভু।

তার আর চিহ্নটুকু নেই।

পরদিন কাগজে কাগজে খবর বেরোয় দুর্ঘটনার। সাঁইত্রিশ জন মানুষ ছিল উড়োজাহাজে, সবাই তারা মারা গেছে সে খবরটা ছেপেছে খুব কম কাগজেই। ছেলের কাছেই নলিনী ব্যাখ্যা ও বিবরণ শোনে।

অনেক দূর থেকে আসা প্লেন হলেও অবশ্য প্লেনের সকলে মরত কিন্তু পেট্রল কম থাকায় এমন ভয়ানক আগুন হত না। ঘাঁটি থেকে সবে তেল বোঝাই নিয়ে আকাশে উঠছিল, তাই এমন ভয়ঙ্কর আগুন হয়েছিল।

কুমার বলে :

—প্রায়ই অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে। হয় এদেশে নয় অন্য দেশে। সারা পৃথিবী জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এরোপ্লেন। মোটর, ট্রেন, এরোপ্লেন—কোনোটাতে একটাও অ্যাকসিডেণ্ট হবে না, এরকম নিখুঁত ব্যবস্থা করতে এখনও দেরি আছে মানুষের।

নলিনী শিউরে ওঠে। হৃৎকম্প তার শুরু হয়েছিল দুর্ঘটনার পর থেকেই। সেটা আরও বেড়ে যায়।

সাত দিন পরে কুমার উড়োজাহাজে বিদেশ যাত্রা করবে।

অনেক ভাগ্যের কথা। কুমারের অনেক চেষ্টা অনেক অধ্য-বসায়ের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। কোম্পানি থেকেই পাঠাচ্ছে। শর্ত শুধু এই যে বিদেশে বিশেষ বিদ্যালাভ করে ফিরে আসার পর এক বছর কুমারের বেতনাদি বাড়বে না। তারপর অবশ্য যথারীতি বিশেষ গুণের বিশেষ মূল্য দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

তাও কি কম ভাগ্যের কথা? মধ্যবিত্ত ঘরের কত গুণী ছেলের চাকরি নেই।

কোম্পানি নিজের প্রয়োজনে নিজের স্বার্থেই অবশ্য তাকে পাঠাচ্ছে, কিন্তু কজন এমন সুযোগ পায়?

শুভা শুনছিল। একেলে মেয়ে, ভাবী শাশুড়ীর মতো সাত দিন পরে কুমারের আকাশপথে যাত্রা করার কথা ভেবে ভেবে তার হৃৎকম্প শুরু না হলেও মুখে নেমে এসেছে দুর্ভাবনার কালো মেঘ।

কুমার তাকে বলে:

—কেন জান? কেন আরও বহুকাল এ রকম হবেই? ব্যবসাদারি আর ব্যক্তিগত লাভের হিসাব বাদ না গেলে মানুষ নিখুঁত ব্যবস্থা করতে পারবে না। মাইনে-করা চাকরের খুঁত হোক কিংবা মেশিনের খুঁত হোক—খুঁত থেকে যাবেই যাবে।

নলিনীর পাংশু বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে শুভা ঢোঁক গিলে বলে:

—থাক না, অ্যাকসিডেণ্টকে বাড়াচ্ছ কেন?

কুমার তার মনের ভাব বুঝতে না পেরে বলে:

—বাড়াচ্ছি না তো। যুদ্ধের কথা বাদ দিলাম। শুধু আমাদের দেশেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বিনা চিকিৎসা, ভেজাল—এ সবে যত লোক মরে সারা পৃথিবীর অ্যাকসিডেণ্টে তত লোক মরে কিনা সন্দেহ। অ্যাকসিডেণ্টকে ভয় করলে চলে না। আমিও তো যাবার কিংবা ফেরবার সময় প্লেনে অ্যাকসিডেণ্ট—

নলিনীর অস্ফুট আর্তনাদ তাকে থামিয়ে দেয়। দুহাতে বুক চেপে ধরে নলিনী চোখ বুজেছে। মার মুখের দিকে চেয়ে কুমারের

খেয়াল হয় যে এতক্ষণ সত্যই সে বোকার মতো কথা বলেছে, ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ চালিয়ে গেছে।

পৃথিবীতে দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে বলে ব্যাপারটা তুচ্ছ করে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মায়ের আতঙ্ক কমানোই তার উচিত ছিল। সত্যই তো! বাড়ির পাশে ঘটল এমন ভয়ানক বিমান দুর্ঘটনা। কয়েক দিন পরে সে বিমানে বিদেশ যাত্রা করবে। মার বুক তো ধড়ফড় করবেই।

মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না নলিনী—সব ঠিক হয়ে গেছে। বলেও লাভ নেই। কে তার কথা শুনবে? নলিনীর হৃৎকম্প বেড়ে, আতঙ্কজড়ানো ব্যাকুলতায় দম যেন আটকে আসতে চায়।

একটা দিন কোনোরকমে চুপ করে থেকে এবং সারা রাত না ঘুমিয়ে ছটফট করে কাটিয়ে পরদিন সকালে নলিনী ছেলেকে বলে :

—জাহাজে গেলে হয় না? আমার একটা কথা রাখ। প্লেনে না গিয়ে তুই জাহাজে যা। কটা দিন না হয় দেরিই হবে পৌঁছতে।

মুখ দেখলে মনে হয় নলিনী যেন কয়েক দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। কুমার বলে :

—সব ঠিক হয়ে গেছে, আর কি পালটানো যায়? তুমি এমন করছ কেন মা? এত লোক হরদম প্লেনে যাতায়াত করছে, তোমার ছেলের বেলাতেই বিপদ ঘটবে? পাগলামি কোরো না। হাজার হাজার লোক প্লেনে চাকরি করে। হপ্তায় তাদের নিয়মমত কয়েক বার দূরে দূরে পাল্লা দিতে হয়। তাদের মায়েদের কথা ভেবে মনটা শক্ত করো।

মন শক্ত করবে! মন কি আর বশে আছে নলিনীর। ছেলের বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই খানিকটা আলগা হয়ে এসেছিল মনের বাঁধনগুলি। তবু দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ না করলে, চোখের জল ফেললে ছেলের অমঙ্গল হবে জানা থাকায় কোনোরকমে বুক বেঁধে ছেলেকে বিদায় দিতে পারত। কিন্তু ছাদে দাঁড়িয়ে, ঐ ধ্বংসদৃশ্য নিজের চোখে দেখার পর আর শক্তি আছে মনকে শক্ত করার!

ছেলে বিদেশে যাক, তাতে আপত্তি নেই। বরং মনে প্রাণে তাই সে চায়। কিন্তু হাওয়ায়-ভাসা জাহাজের বদলে জলে-ভাসা জাহাজে ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে যেন পাগল হয়ে ওঠে নলিনী।

শুভার বাবার কাছে দরবার করতে যায়। সত্যপ্রিয় তার ব্যাকুল আবেদন বড়ই হালকাভাবে নেয়। তামাশা করে বলে যে কুমারের মেম বিয়ে করার দুর্ঘটনার কথা ভেবেই তো সে মেয়ের বিয়েটা স্থগিত করেছে। ওদের বিয়েটা চুকে যাবার পর সে একটা স্পেশাল প্লেন ভাড়া করবে। কেবল বেয়ান আর বেয়াই তারা দুজনে সেই প্লেনে চেপে কাশ্মীর বেড়িয়ে আসবে।

সত্যপ্রিয়ের কাছে আমল না পেয়ে বাড়ি ফিরে মাথা যেন একেবারেই বিগড়ে যায় নলিনীর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সে বলে :

—না, উড়োজাহাজে আমি তোকে যেতে দেব না। আমার মৃতদেহ ডিঙিয়ে তোকে যেতে হবে। তোর রওনা হওয়ার আগে বঁটি দিয়ে গলা কেটে সদর দরজায় শুয়ে থাকব।

আপিস থেকে খরচা দিয়ে বিদেশ ঘুরিয়ে আনবে, চাকরিতে উন্নতি হবে—ত্বর্ঘটনার ভয়ে নলিনী প্রাণপণে কুমারকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে জেনে নিখিলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

সে গিয়ে নলিনীকে বলে :

—মাসীমা, এ কি পাগলামি জুড়েছেন? অনেক ভাগ্যে এ রকম স্থযোগ মেলে।

আমি স্থযোগ পেলে একেবারের জায়গায় দশ বার ঘুরে আসতাম।

নলিনী বলে :

—কী করব বল্ বাবা, সেদিন এরোপ্লেনের ত্বর্ঘটনা দেখার পর থেকে আমার বুকের ধড়ফড়ানি কমছে না। বানিয়ে বানিয়ে তো বলছি না বা করছি না কিছু—ভয়ে ভাবনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছি।

—তাই তো বলল কুমার। বেচারা ভারি মুশকিলে পড়ে গেছে। মায়ের এরকম অবস্থা দেখে ছেলের মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় ভাবুন তো!

—সে তো ভাবছি, নিজেকে সামলাতে পারছি না। করব কী?

—এটা আপনার অস্থুখ। কুমারকে যেতে দিন, নিজের চিকিৎসা করুন।

—পারিস তো চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে দে না। সামলে থাকতে পারলে আমি গোলমাল করব কেন?

একটু ক্ষীণভাবে হাসে নলিনী। বলে :

—তুই যেমন পাগল! আমার খাতিরে কুমার যাওয়া বন্ধ করবে ভেবেছিস? এক হপ্তা পিছিয়ে দিয়েছে, আমায় একটু সামলে তুলে যাবে ভেবেছে। আমি জানি না ভেবেছিস যে, মরলেও ওর যাওয়া ঠেকাতে পারব না, শেষ পর্যন্ত ও যাবেই?

নিখিল খুশী হয়ে বলে:

—এই তো দিব্যি কথা বলছেন। চোখকান বুজে ছেড়ে দিন বেচারাকে—ঘুরে আসুক। দেখতে দেখতে বছর কাবার হয়ে যাবে।

নলিনীর শারীরিক দুর্বলতা খুবই প্রকট। চোখ বুজে বলে:

—বছর কাবার হবে পরে। তার আগে আমিই কাবার হব।

নিখিল জোরের সঙ্গে বলে:

—না, আপনি কাবার হবেন না। আমি আপনাকে কাবার হতে দেব না। আমি দায়িত্ব নিলাম।

দুহাতে কপাল চেপে ধরে নলিনীর বসার ভঙ্গীটা মর্মান্তিক মনে হয় নিখিলের।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুমার সিগারেট ফুঁকছিল। নিখিল ডেকে বলে:

—একজন ডাক্তার ডাকিয়ে মাসীমাকে দেখাতে পারিস নি?

কুমার বলে:

—ডাক্তার দেখিয়ে কী হবে? ছেলেকে বিদেশে যেতে দিতে চায় না—এ ব্যাপারে ডাক্তার কী করবে?

—মনটা ঠাণ্ডা রাখার ওষুধ দিতে পারে, ভয় ভাবনা ভোঁতা করার ওষুধ দিতে পারে। তা হলে আর তোর ব্যাপার নিয়ে এ রকম করতেন না।

—মার শরীরটা ভেঙে গেছে।

—যাবেই তো। অসুখ হলে শরীর ঠিক থাকে, মন ঠিক থাকে ?

—কী করব বুঝতে পারছি না ভাই।

—ডাক্তার এনে দেখা।

—তুই এনে দেখা না ভাই।

—দেখাবই তো। মাসীমার চিকিৎসার দায় আমি নিয়েছি। পয়সা-কড়ির দায় কিন্তু তোদের।

—যা লাগবে বাবাও দেবে, আমিও দেব। মামার কাছেও নয় কিছু সাহায্য চাইব।

—মামা দেবে ? কোনো দিন তো খোঁজ খবর নেয় না।

কুমার খেদের হাসি হাসে।

—আগে ডেকেও জিজ্ঞাসা করত না। আমি চাকরি পেয়েছি, বাইরে যাচ্ছি, অনেক উন্নতি হবে—এসব জানার পরে এসে খাতির করছে। . বড় ছেলে খুব ভালো পাস করে চলেছে। ইচ্ছাটা কি জানিস ? আমার মতো বাইরে যাবার ব্যবস্থা যদি কিছু হয়।

ডাক্তার আসে। একটা ইনজেকশন তৈরি করে। বেশ শান্ত-ভাবেই নলিনী সব দেখে যায়। ইনজেকশন দিতে গেলে হঠাৎ থাবা মেরে সিরিঞ্জটা ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে :

—ইয়ার্কি রাখুন ডাক্তারবাবু। আমায় ঘুম পাড়িয়ে কী হবে? ছেলে উড়োজাহাজে সুইসাইড করতে যাচ্ছে—ওকে বরং সামলান।

বিদেশ যাত্রার জরুরী আয়োজনের জন্যই কুমারকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরে শোনে যে, আধ ঘণ্টা আগে নলিনী অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তার জ্ঞান ফিরে এলে, একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলে কুমার বলে :

—একেবারে মরণ পণ করে আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা শুরু করলে মা? তুমি এমন করলে আর কি আমার যাওয়া হয়?

জীবনে কোনো দিন ছেলেকে একটা কড়া ধমকও দেয়নি নলিনী। আজ সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে :

—আমি মরি বাঁচি তাতে তোর কী রে বজ্জাত? তোকে যেতেই হবে। না গেলে জীবনে কোনো দিন আমি তোর মুখ দেখব না—কাশীতে গিয়ে থাকব।

কুমার বলে :

—তা হলে একটু শান্ত হও। তোমায় এ অবস্থায় রেখে আমি কী করে যাব? না গেলে কিন্তু চাকরি খতম হবে মা!

নলিনী দৃঢ় স্বরে বলে :

—বললাম তো তুই যাবি। উড়োজাহাজেই যাবি।

কুমার আশ্চর্য হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

যে আতঙ্কে কদিন দিশেহারা হয়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, এমনিভাবে আপনা থেকে সে আতঙ্ক মিলিয়ে গেল! কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থেকে এমন শক্ত হয়ে গেল নলিনীর মন যে

ছেলেকে উড়োজাহাজে বিদেশে পাঠানোর ভয়কে এমন তেজের সঙ্গে জয় করতে পারল!

শুভা বলে :

—এ রকম হয়। আনন্দ বেদনা ভয় এ সব একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ আর সইতে পারে না, একটা শক লাগার মতো। ব্যাপারটা ঘটে এই যে, মনটা ভোঁতা হয়ে যায়। অ্যাকসিডেন্টটা চোখে দেখে একটা হিস্টিরিয়ার ভাব এসেছিল, সেটা চরমে উঠে কেটে গেছে।

তাই হবে। নতুবা নলিনী যে ভাবে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, উড়োজাহাজে যাত্রা বাতিল করার কথা একবার উচ্চারণও করে না—তার কোনো মানে হয় না। দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আঘাতে মনটা বিকল হয়ে গিয়েছিল। সেটা কেটে গেছে।

যাত্রা করার দিন ঘনিয়ে আসে।

কারও টের পেতে বাকী থাকে না যে প্রাণপণ চেষ্টায় নলিনীকে প্রাণের ব্যাকুলতা চেপে রাখতে হচ্ছে। কিন্তু সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। ছেলের সুদূর বিদেশ যাত্রার দিন কাছে এলে মায়ের প্রাণ তো ব্যাকুল হবেই।

শুভা বলে :

—কান্না পেলেও কাঁদবেন না। তোমার যে অমঙ্গল হবে।

—তুমি ?

—আমি কাঁদলে দোষ হবে না। গুরুজন তো নই-ই, আপনজনও নই।

দুপুরে আত্মীয়বন্ধু কয়েকজনকে খেতে বলা হয়েছিল। কুমারের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ নিয়ে গল্পগুজব করতে করতে বেলা বাড়ে। যারা স্নান করে আসেনি তারা একে একে স্নান সেরে নেয়।

সকলের শেষে যায় কুমার।

অনেকক্ষণ কেটে যায়, কুমার আর বেরোয় না।

নলিনী বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে :

—তোর এত দেরি হচ্ছে কেন রে ?

কুমারের সাড়া মেলে না।

দরজা ভাঙা হয়। দেখা যায়, কুমার মেঝেতে পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে সাবানের ফেনা, মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যেই একজন আত্মীয় ছিল ডাক্তার। রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করতে করতে সে জানায় যে আঘাত মারাত্মক নয়, কিন্তু বড় বেশী রক্তক্ষয় হয়ে গেছে—তাড়াতাড়ি রক্ত দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

রক্ত চাই। রক্ত। পাত করার রক্ত নয়, ক্ষয় করার রক্ত নয়, মানুষের প্রাণ বাঁচানোর রক্ত।

নলিনী আর্তকণ্ঠে বলে :

—আমি রক্ত দেব। আমার সমস্ত রক্ত দেব।

ডাক্তার আত্মীয় বলে :

—আপনি শান্ত হোন !

টার্নার সুখেন্দু। জড় ধাতুখণ্ডকে ঘষে মাজে, গড়ে পেটে—নিরবয়ব পিণ্ড রূপ পায়, আকার পায়। সুখেন্দুর মস্তিষ্কের নির্দেশে আর হাতের তাড়নায় ধাতু বস্তু হয়ে ওঠে, যন্ত্র হয়ে ওঠে, গতির প্রতীক আর সৃষ্টির সহায়।

আপসোস জমা হয়ে ছিল সুখেন্দুর। ভদ্রলোক মালিক হবার নেশা চেপেছিল তার।

আরও এক উগ্র নেশায় সে নেশা অবশ্য ঝিমিয়ে পড়েছিল—শান্তিলতার সুঠাম দেহকে পাবার নেশা।

আপোস করতে হয়েছিল। কিন্তু রাগ মরে নি। শান্তিলতাও সে রাগের জড় মারতে পারে নি।

ইয়াকুবের কথায় তার রাগ পড়েছিল।

—ভাই, কাজের মানুষের চেয়ে বড় কে? কাজ না হলে সংসার বাঁচে? আমাদের হাতেই সংসার চলছে। ঠিক কি না ভেবে দেখো।

এ তল্লাটের পাকা টার্নার তুমি। তোমার মতো দেমাক কার? এ কারখানা ও কারখানা থেকে প্রায়ই তোমার ডাক পড়ে। তুমি এ কারখানা ছেড়ে যেতে চাও না। কেন? এদের তুমি ভালোবাস, এরা সব তোমাকে ভালোবাসে। তোমার মতো সুখ কার বলো? মিছে আপসোস ছাড়ো সুখেন্দু ভাই।

সুখেন্দু আপসোস ছেড়েছে।

কাজের মানুষকে ভালোবেসেছে।

শান্তিলতাকে নতুন করে চিনেছে সুখেন্দু। তার ঋজুকোমল শরীরটার সুরভি উত্তাপ এক রাত্রে তাকে বেপরোয়া মাতাল করে তুলেছিল। কিন্তু তার মনের সন্ধান করে নি। মেয়েমানুষের আবার মন কী!

আজ শান্তিলতার মনের অগাধ ভালোবাসা, অসীম ধৈর্য আর অতল শান্তির উৎসে স্নান করে দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে সুখেন্দু। শান্ত, বিবেচক, প্রেমিক। রাত্রে বুকে জড়িয়ে নেয় শান্তিলতাকে নতুনতর আবেগে। বলে:

—আমার স্বভাবটা বড় একরোখা। গোঁ চাপলে সব গোলমাল হয়ে যায়, শান্তি। ভুল করলে, একগুঁয়েমি দেখলে তুমি কিছু বল না কেন বলো তো! আমার অন্যায় হলে বলবে। বলবে তো? বলো, বলবে তো?

—পুরুষমানুষ একটু একগুঁয়ে হওয়া ভালো। না হলে আমার ভালো লাগে না একটুও।

—সত্যি?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি।

গাঢ় হয়ে মিশে যায় শান্তিলতা সুখেন্দুর বুকে।

পরদিন সন্ধ্যা প্রায় কেটে গেল। সুখেন্দুর দেখা নেই।

শান্তিলতা রুটি বেলছিল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু তখনও আলো জ্বালে নি। সুখেন্দু না ফিরলে আলো জ্বালে না। ঘরের মানুষ ঘরে না ফিরলে তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা করে না।

পুকুরপাড়ের বস্তির বলাই তার রান্নাঘরের দাওয়ায় আসে! বলে :

—কাকা তোমায় ডাকছে।

—কেন রে ?

—কী যেন হয়েছে কারখানায়। মারামারি—

বলতে বলতে সহদেব এসে হাজির।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তিলতা শোনে সব কথা।

বিকালে আজ আবার স্নান করেছে, তোরঙ্গ খুলে অনেকদিন পরে ফুলশয্যার নীলাম্বরীখানা পরেছে কী ভেবে কে জানে! পুষ্পর মাকে ডাকিয়ে এনে যত্ন করে চুল বেঁধেছে, খোঁপায় দিয়েছে বেলফুলের মালা। লম্বা সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দিয়ে গেছে পুষ্পর মা, কপালে বড় একটা কুমকুমের টিপ।

বলতে গিয়ে সহদেব একটু থমকে যায়। আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে মুখ নীচু করে জানায় --

বেআইনী হুকুম জারি করে বসে বড় সায়েব। প্রতিবাদে সবাই কাজ বন্ধ করে যে যার জায়গায় বসে। খেপে গিয়ে বড় সায়েব বাবুরাজার দলকে এনে কারখানার মধ্যে ঢোকায়। মজুররা রুখে দাঁড়ায়। সুখেন্দুই ছিল সকলের সামনে। বাবুরাজার লাঠিতে তার মাথায় খুব জোর চোট লেগেছে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সেখান থেকেই ফিরছে সহদেব। এখনো জ্ঞান ফিরে আসে নি।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তিলতা। দূর থেকে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়ে তার শান্ত কঠিন কালো মুখে। জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে কুমকুমের টিপ,—চওড়া সিঁথি।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যায় শান্তিলতা। পর মুহূর্তেই বেরিয়ে আসে।

বলে :

--আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।

[অপর পৃষ্ঠা দেখুন]

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত বই :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত উপন্যাস

হরফ ৪্

প্রেস, কম্পোজিটর, লেখক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত এ-উপন্যাস স্বর্গত লেখকের মতে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য কীর্তি।

পাশাপাশি ৩৷৽

'যুগান্তর' পত্রিকা বলেন,—'শক্তিশালী লেখা। ইহা গতানুগতিক হইতে পৃথক। ইহার স্ত্রী চরিত্রগুলি বাস্তব ও জীবন্ত।...

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবিতকালের সর্বশেষ উপন্যাস

মাশুল—৩৷৽

লেখকের জীবিতকালের সর্বশেষ উপন্যাস। যুক্তি নিয়ম ও অন্ধসংস্কারের সংঘাত জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছে, ভুল করেছে—মাশুল গুণছে কিন্তু বাঁচবার চেষ্টায় ঢিল নেই, এগিয়ে যাবার চেষ্টায় কামাই নেই।

নাগপাশ—৩্

'যুগান্তর' বলেছেন—সমাজ দর্শনের সঙ্গে জীবন দর্শনের একটি নিলিপ্ত বলিষ্ঠ এবং প্রায় নির্মম ভঙ্গী এই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে অসাধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সোনার পুতুল—৩৷৽

......গ্রন্থকার পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গভীর, রচনাভঙ্গী অপূর্ব। চরিত্র বিশ্লেষণের নিখুঁত নিপুণতা, কাহিনীর সরসতা ও সংলাপের মাধুর্য পাঠকের চিত্ত অভিভূত করে। উপন্যাসটির ভিতর চিন্তার প্রচুর খোরাক আছে।'

......'যুগান্তর' পত্রিকা (২।২।৫৮)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

অবরোধ—৩৲

সংসারের সমস্ত গরল নিঃশেষে পান করে যে মেয়েটি অমৃত বিলাবার সর্বনাশা পণ করেছিল, নীলকণ্ঠী সেই কৃষ্ণার বেদনাবিধুর জীবনায়ন।

বনকপোতী—৩।০

ঘর বাঁধার মোহে ঘর ছাড়া মেয়ের করুণ উপাখ্যান। এক মর্মস্পর্শী বেদনা মধুর কাহিনী।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত উপন্যাস

আধুনিকা—৩৷৷০

'মাসিক বসুমতীতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'স্বয়ংসিদ্ধা'-খ্যাত লেখকের অপর এক সার্থক সৃষ্টি। 'আধুনিকার রসোত্তীর্ণ সংজ্ঞা আধুনিক উপন্যাস রসিকদের এক অপূর্ব সম্পদ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

তামস তপস্যা ৪৲

'অ্যাকাডেমি পুরস্কার' ও 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত

বিখ্যাত লেখক **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** নতুন উপন্যাস

আবার নদী বয় ৩।০

উপহারোপযোগী অপূর্ব প্রচ্ছদপট সম্বলিত। উপহার পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি।

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

দেবাংশী ৩৲

বাংলার পশ্চিম সীমান্তে লালমাটি আর শালবনের বুকে মনুষ্যত্বের বলিষ্ঠ চেতনায় চির-জাগ্রত একটি বেপরোয়া ছন্নছাড়া মানুষ আর ব্যাকুল

কামনাময়ী আদিম এক নারীর জীবন বেদ! বাস্তব ধর্মী লেখকের অন্যতম বলিষ্ঠ রচনা।

মেঘে ঢাকা তারা ৪॥০

চলচ্চিত্র জগতে যুগান্তকারী শক্তিপদ রাজগুরুর একটি সার্থক উপন্যাস **মেঘে ঢাকা তারা** উপহারে শ্রেষ্ঠ!

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

পঙ্কজা ৩৲

একটি মেয়ের জীবনে প্রেম এলো এবং প্রাণের বিশালতায় হলো তার শুদ্ধি। তারই এক অপরূপ সজীব কাহিনী।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

দুর্গতোরণ ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অমর কাহিনী

রঙের টেক্কা ৪॥০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবার আগেই বইটা একবার পড়ে নিন।

কালোপাঞ্জা ৪॥০, ধূমকেতু ৪৷৹

গোপাল ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

অপুর বিজয়া ৩॥০

রবিশঙ্কর শ্রীমানীর

সুস্থ জীবন ১৷০

ব্যায়ামাচার্য **শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ** বলেছেন—'শ্রীরবিশঙ্কব শ্রীমানীর উৎসাহ ও চেষ্টা অসাধারণ, যা তাঁর দেহকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলেছে। **'সুস্থজীবন'** বইখানি তাঁর দেহের মতই সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন—যা সহস্র সহস্র ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থজীবন লাভ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের

উপমা কালিদাসস্য ৩৲

কালিদাসের উপমার সুনিপুণ আলোচনা। অপূর্ব প্রচ্ছদপট সম্বলিত।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

পুরানো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী ৩৲

ভাববাদ খণ্ডন ২৷৷৹

দেশ বিদেশের দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

ছোটদের জন্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থমালা

একালের বই

প্রথম খণ্ড ১৷৷৹

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

ভূতের বেগার ১৷৷৹

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অঙ্কুর (জার্মিনাল) ১৷৷৹

খনি মজদুরদের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লিখিত বিগত শতাব্দীর এ উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।